মাসিক

আল-আবরার

Jab\Al-Abrar Art copy.jpg not found.

مجلة شهرية دعوية فكرية ثقافية اسلامية

(প্রস্তুতিমূলক-২)

The Monthly AL-ABRAR

মার্চ ২০১২ইং, রবিউছ ছানী ১৪৩৩হি:

ربيع الثاني ١٤٣٣هـ، مارس ٢٠١٢

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক :

ফক্বীহুল মিল্লাত মুফতী আবদুর রহমান দা. বা.

প্রধান সম্পাদক:

মুফতী আরশাদ রহমানী

সম্পাদক

মুফতী কিফায়াতুল্লাহ শফিক

নির্বাহী সম্পাদক:

রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী

সহকারী সম্পাদক:

মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন

প্রচার সম্পাদক:

মাওলানা লোকমান

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি:

মুহাম্মদ হাশেম

সম্পাদনা বিষয়ক উপদেষ্টা

মুফতী জামাল উদ্দীন
মুফতী এনামুল হক্ব কাসেমী
মুফতী মাহমূদুল হক্ব
মুফতী মুহাম্মদ সুহাইল
মুফতী আব্দুস সালাম
মাওলানা হারুন
মুফতী রফীকুল ইসলাম আল-মাদানী
মুফতী জা'ফর আলম কাসেমী

বিনিময়: ১৫ (পনের) টাকা মাত্র

প্রচার সংখ্যা - ১০,০০০(দশ হাজার)

যোগাযোগ

সম্পাদনা দফতর:

মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ
বসুন্ধরা, ব্লক-ডি, ফক্বীহুল মিল্লাত স্মরণী,
বসুন্ধরা, বাড্ডা, ঢাকা।
ফোন: ০২৮৪০২০৯১,০২৮৮৪৫১৩৮
মোবাইল:০১৮১৭০০৯৩৮৩, ০১১৯১২৭০১৪০
ই-মেইল: monthlyalabrar@gmail.com
ওয়েভ :http://monthlyalabrar.wordpress.com/

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় : ২
পবিত্র কালামুল্লাহ থেকে :.......................... ৪
পবিত্র সুন্নাহ থেকে : ৫
দরসে ফিক্বহ: ৬
মুফতী শাহেদ রহমানী
ফকীহুল মিল্লাত দা.বা. এর ইরশাদসমূহ:......... ৯
মাওলানা লোকমান
চেয়ারে বসে নামায আদায় প্রসঙ্গ :................ ১১
মুফতী এনামুল হক কাসেমী
পবিত্র কুরআন মজীদের বিশুদ্ধ তেলাওয়াত : ১৫
মুফতী জাফর আলম আনোয়ার কাসেমী
ভালবাসা: একটি পর্যালোচনা :..................... ১৮
মাওলানা কাজী ফজলুল করিম
হযরত থানভী রহ. এর রচনা সম্ভার...:. ২১
সলিম মাহদী
কোয়ান্টাম মেথড-২:.............................. ২৪
মুফতী শরীফুল আজম
সায়্যিদ আসআদ মাদানী রহ. :...................... ২৭
মাওলানা আনোয়ার হোসাইন
মাওলানা ফজলুর রহমান. এর বয়ান: :............. ২৯
মাওলানা জসিম উদ্দীন কাসেমী
মোবাইল: ক্ষতি-ঝুঁকি-১ :.......................... ৩০
রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী
আত্মশুদ্ধি :.. ৩৬
মাওলানা হাবীবুল্লাহ
জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান ৩৮
হযরত ফক্বীহুল মিল্লাত সাহেবের বয়ান: ৪১
তারানা ৪৪
খবরাখবর ৪৫

সম্পাদকীয়

বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের করণীয়

বিশ্বময় বহুবিদ সমস্যা ও অশান্তির জোয়ার মানবতাকে নিয়ে যাচ্ছে এক অন্ধকার গন্তব্যের দিকে। এ সকল সমস্যার কারণ ও উপকরণ সম্পর্কে বিভিন্ন গবেষক-চিন্তাবিদ আপন আপন চিন্তাধারা ও জ্ঞানানুসারে অসংখ্য মতামত ব্যক্ত করেছেন এবং করছেন। অন্যদিকে আল্লাহ তাআলা বলেন ظهر الفساد فى البر والبحر بما كسبت ايدى الناس জল-স্থলে তথা সর্বত্র মানুষের কর্মফল হিসেবেই নানা বিপদাপদ বিস্তৃত হচ্ছে। অন্যত্র আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم "এবং তোমাদের প্রতি যেসকল বালা মুসিবত পৌঁছে সেগুলো তোমাদের হাতের কর্মফল হিসেবেই পৌঁছে"। সুতরাং এসকল সমস্যা, অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি, অভাবিত বিপর্যয় মানুষের দোষ-ত্রুটি ও পাপ-পঙ্কিলতার কারণেই সৃষ্ট তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে মানুষের একটি স্বভাব হল নিজের দোষ-ত্রুটিকে আড়াল করে সমস্যার জন্য অন্য যে কোন বস্তুকে দায়ী করা। অথচ সংগত হত যদি প্রত্যেকে নিজের দোষ ত্রুটিকে স্বীকার করে নিয়ে সে পথে সংশোধন ও সংস্কারের চেষ্টা করত।

যদিও সকল প্রকার সমস্যা, বালা মুসিবত এবং পেরেশানী নিজেদেরই গোনাহ ও পাপাচারের প্রতিফল, তারপরেও বাহ্যিকভাবে সমস্যাগুলোর বহু বাস্তব কারণ ও উপকরণ আমাদের আলোচনায় আসে। এমনকি বিভিন্ন প্রচারমাধ্যম সে সকল বস্তুতান্ত্রিক কারণসমূহ প্রচারে খুবই তৎপর। বড় বড় গবেষকগণ সে সকল কারণকে আমলে নিয়ে তা প্রতিরোধে বিভিন্ন কর্মপন্থাও উদ্ভাবন করে থাকেন। প্রকাশ্য কারণকে আমরাও অস্বীকার করি না। বরং আমরা বলি প্রকাশ্য কারণ যাই হোক, সে ক্ষেত্রে পুরোপুরি চেষ্টা-প্রচেষ্টাকে অব্যাহত রাখা জরুরী। তবে আধুনিক যুগে এসে বাহ্যিক কারণগুলোর প্রতি আমরা এতই ধাবিত, স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানবজাতির এরূপ বিপর্যয়ের যে মূল কারণগুলো বর্ণনা করেছেন সেদিকে দৃষ্টিপাত করতে হবে এমন চিন্তার সুযোগও আমাদের হয়ে উঠে না। অথচ আল্লাহ তাআলা কর্তৃক বর্ণিত মৌলিক কারণগুলো সংশোধন হওয়া ছাড়া বাস্তব বিপর্যয় থেকে উত্তরণ কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। আমাদের জানা মতে মানুষকে এসকল বিপর্যয় থেকে রক্ষা এবং বিশ্বময় শান্তি ও স্থিতি প্রতিষ্ঠার জন্য এপর্যন্ত সম্ভাব্য অগনিত পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে, কিন্তু তাতে এসকল পরিস্থিতির উন্নতির স্থলে অবনতিই হয়েছে।

দুনিয়াতে মানব জাতি যে সকল সমস্যা ও বিপদাপদের যাতাকলে পিষ্ট এর কয়েকটি নিম্ন রূপ। ১. মৃত্যুর হার বৃদ্ধি, ২.খুন খারাবী, ৩. নিত্যনতুন রোগ ব্যাধি, ৪. রিযিক তথা জীবন উপকরণের অপ্রতুলতা, ৫. দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, ৬. অনাবৃষ্টি-খরা, ৭. পরস্পর মতানৈক্য ও অস্থিতিশীলতা, ৮. চুরি-ছিনতাই-রাহজানি, ৯. শংকা ও ভীতি এবং ১০ ক্ষমতাসীনদের জুলুম অত্যাচার ইত্যাদি। এসকল অশান্তির বেড়াজালে আটকে আছে আজ বিশ্ব-মানবতা। অথচ আজ থেকে পনেরশত বছর পূর্বে বিশ্বমানবতার মুক্তিরদূত রাসূলুল্লাহ -সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- সম্ভাব্য বিভিন্ন সমস্যার ভিন্ন ভিন্ন কারণ ও উপকরণ বর্ণনা করে গেছেন। যেমন নবী সা. ইরশাদ করেছেন,

১." ব্যভিচার যখন ব্যাপকতা লাভ করবে, মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে"। ২. সিদ্ধান্ত নেয়ার বেলায় যখন জুলুম বা সীমালংঘন করা হবে খুন-খারাবী বৃদ্ধি পাবে। ৩. "অশ্লীল কাজ যখন প্রকাশ্যে সম্পাদিত হয় তখন এমন এমন রোগব্যাধি প্রকাশ পায়, যা তাদের পূর্বপুরুষদের

১." ব্যভিচার যখন ব্যাপকতা লাভ করবে, মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে"। ২. সিদ্ধান্ত নেয়ার বেলায় যখন জুলুম বা সীমালংঘন করা হবে খুন-খারাবী বৃদ্ধি পাবে। ৩. "অশ্লীল কাজ যখন প্রকাশ্যে সম্পাদিত হয় তখন এমন এমন রোগব্যাধি প্রকাশ পায়, যা তাদের পূর্বপুরুষদের কাছেও কোন সময় দেখা যায়নি।" ৪. "নিশ্চয় মানুষ তার কৃত গোনাহের কারণে রিযিক থেকে বঞ্চিত হয়"। "মিথ্যা রিযিককে হ্রাস করে দেয়"। ৫. ওজনে কম করার কারণে রিযিক বন্ধ করে দেয়া হয়, দুর্ভিক্ষ ও কঠোর পরিশ্রমের শিকার হতে হয় এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। ৬. "যখন জনসাধারণ যাকাত আদায় করে না, তখন বৃষ্টি রুখে দেয়া হয়" , "ক্ষমতাসীনরা যখন অত্যাচার করতে লাগল তখন বৃষ্টি হ্রাস পেল"। ৭. " মুসলমানগণ যখন কুরআনের বিধান প্রতিষ্ঠা করে না তখন মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য ও সংঘাত বেড়ে যায়", "নামাযে কাতার ঠিক না কারলে অন্তরসমূহে ভাঙ্গন সৃষ্টি হয়"। ৮. " যে সম্পদে যাকাত ওয়াজিব হয়েছে এবং আদায় করেনি, যাকাতের সে অংশ উক্ত সম্পদকে ধ্বংস করে দেয়"। ৯. " যে সম্প্রদায়ে সুদ-ঘুষের লেনদেন হবে এবং অবিচার সীমা ছেড়ে যাবে তাদের অন্তরে শংকা ও ভীতি ছেয়ে যায়", "যখন কোন সম্প্রদায় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করে তবে আল্লাহ তা'আলা সে সম্প্রদায়ের উপর দুশমনকে ক্ষমতায় বসিয়ে দেয়।" ১০."...কারণ ক্ষমতাসীনদের অত্যাচার (নিজেদের) গোনাহের কারণেই হয়ে থাকে"।

কাছেও কোন সময় দেখা যায়নি।" ৪. "নিশ্চয় মানুষ তার কৃত গোনাহের কারণে রিযিক থেকে বঞ্চিত হয়"। "মিথ্যা রিযিককে হ্রাস করে দেয়"। ৫. ওজনে কম করার কারণে রিযিক বন্ধ করে দেয়া হয়, দুর্ভিক্ষ ও কঠোর পরিশ্রমের শিকার হতে হয় এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। ৬. "যখন জনসাধারণ যাকাত আদায় করে না, তখন বৃষ্টি রুখে দেয়া হয়" , "ক্ষমতাসীনরা যখন অত্যাচার করতে লাগল তখন বৃষ্টি হ্রাস পেল"। ৭. " মুসলমানগণ যখন কুরআনের বিধান প্রতিষ্ঠা করে না তখন মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য ও সংঘাত বেড়ে যায়", "নামাযে কাতার ঠিক না কারলে অন্তরসমূহে ভাঙ্গন সৃষ্টি হয়"। ৮. " যে সম্পদে যাকাত ওয়াজিব হয়েছে এবং আদায় করেনি, যাকাতের সে অংশ উক্ত সম্পদকে ধ্বংস করে দেয়"। ৯. " যে সম্প্রদায়ে সুদ-ঘুষের লেনদেন হবে এবং অবিচার সীমা ছেড়ে যাবে তাদের অন্তরে শংকা ও ভীতি ছেয়ে যায়", "যখন কোন সম্প্রদায় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করে তবে আল্লাহ তা'আলা সে সম্প্রদায়ের উপর দুশমনকে ক্ষমতায় বসিয়ে দেয়।" ১০."...কারণ ক্ষমতাসীনদের অত্যাচার (নিজেদের) গোনাহের কারণেই হয়ে থাকে"।

উল্লেখিত সমস্যা, বালা মুসিবত ও বিপর্যয়গুলো আজ আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রের চিহ্নিত সমস্যা। এমনকি সবই মৌলিক সমস্যা বলেই পরিগণিত। এসকল সমস্যা সমাধানে রাষ্ট্রপক্ষ এবং জনগণ চেষ্টার কোন খুটিনাটি বিষয়ই বাদ রাখছে না। ব্যয় করা হচ্ছে অসংখ্য অর্থ। কিন্তু এত কর্মসূচী, পরিকল্পনা ও পদক্ষেপ বাস্তবায়নের পরেও কোন সমস্যা এমন নেই যার সমাধান হওয়া দূরে থাক বরং সমস্যা দিনদিন বাড়ছেই। তা থেকে প্রতীয়মান হয়, এ সমস্যাবলির চিহ্নিত বাহ্যিক কারণ ও উপকরণগুলো রোধ করা এর সমাধানের জন্য যথেষ্ট নয়। বরং মহান আল্লাহ তা'আলা ও মহানবী স. সমস্যাগুলোর যে সকল কারণ বর্ণনা করেছেন সেগুলোকেই মূলকারণ বিবেচনা করতে হবে। কারণ ও উপকরণ হিসেবে যে সকল মানবীয় দোষ-ত্রুটির কথা হাদীছে উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো সংশোধনের সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এসব দোষ-ত্রুটিকে 'না' বলার পাশাপাশি মুসলিম উম্মাহর প্রত্যেকের পক্ষ থেকে যদি নিম্নবর্ণিত দুটি কাজ গুরুত্ব ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে বাস্তবায়ন করা যায় তবে মানবতার সৃষ্ট সমস্যাগুলো থেকে অচিরেই রক্ষা পাওয়া সম্ভব হবে ইনশাআল্লাহ।

১. বেশি বেশি ইস্তিগফার করা। তথা কায়মনোবাক্যে আল্লাহর কাছে অধিক হারে নিজ গোনাহ ও পাপ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করা। ইস্তিগফারের মাধ্যমে গোনাহ মাফ হয়। ইস্তিগফারে যেমন গোনাহ মাফ হয়, ছাওয়াব বা পুণ্যেও সংযোজিত হয়, তেমনি অন্যান্য বহু উপকারের কথা পবিত্র কুরআন ও হাদীছ শরীফে বর্ণনা করা হয়েছে। সূরা হুদ ও সূরা নূহ-এ ইস্তিগফারের কারণে শক্তি বৃদ্ধি, সম্পদ ও সন্তান সন্ততি অর্জন এবং বৃষ্টিতে বরকত ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে। হাদীছ শরীফে এসেছে, যে লোক ইস্তিগফারে রত থাকবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর সকল প্রকার কঠিন থেকে কঠিন সমস্যা থেকে উত্তরণের ব্যবস্থা করে দেবেন। সকল প্রকার দুশ্চিন্তা মুক্ত করে রিযিক প্রশস্ত করে দেবেন, এমন স্থান থেকে তার রিযিকের ব্যবস্থা করে দেবেন যা সে চিন্তাও করতে পারবে না।

২. বেশি বেশি দু'আ করা:

বিপদাপদ থেকে মুক্তি ও সকল প্রকার সমস্যা সমাধানে দু'আর ভূমিকা অপরিসীম। হাদীছ শরীফে আছে নিঃসন্দেহে দু'আ আগত অনাগত সকল প্রকার বিপদাপদ থেকে রক্ষার ক্ষেত্রে উপকারী। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমরা আমার কাছে দু'আ-প্রার্থনা কর, আমি কবুল করব।" সুতরাং বিপদাপদ ও সমস্যা যত বড়ই হোক আল্লাহর কাছে অত্যন্ত আন্তরিক চিত্তে, অশ্রুসজল নয়নে গুরুত্ব সহকারে নিয়মিত দু'আ করলে আল্লাহ তা কবুল করে বিপদাপদ থেকে মুক্ত করবেন তাতে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই।

হযরত ফক্বীহুল মিল্লাত দা. বা. বলেন, দু'আ আল্লাহ পাক কবুল করবেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। দু'আর তৎক্ষণাত লাভ হলো প্রথমত: ছাওয়াব হবে, দ্বিতীয়ত: মনে প্রশান্তি আসবে।

সর্বশেষ আমি বলব সমস্যাগুলোর বাহ্যিক কারণসমূহের প্রতি যেমন আমরা গুরুত্ব সহকারে মনোনিবেশ করি তেমনি যদি আল্লাহ তা'আলা ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক নির্দেশিত পথে আন্তরিকতা ও নিয়মতান্ত্রিকতার সহিত গুরুত্বসহকারে কাজ করি তবে নিঃসন্দেহে আমরা যাবতীয় সমস্যা, বিপদাপদ, অধঃপতন এবং বিপর্যয় থেকে মুক্তি পেতে পারি। এটিই বাস্তব, এটিই সত্য। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাওফীক দান করুন, আমীন।

আরশদ রহমানী,

ঢাকা। ১০-০৩-২০১২

১। মুআত্তা মালেক ২/৪৬০, হাদীস নং ২৬, ২। মুআত্তা মালেক ২/৪৬০, হাদীস নং ২৬, ৩। আল-ইসতিযকার ৫/৯৮, ৪। আল-মুসতাদরিক আলাসসহীহাইন ১/৪৯৩, হাদীস নং ১৮১৪, ইবনে মাজাহ হাদীস নং ১৪৪২, মুসনাদে আহমদ ৫/২৭৭, ৫। আল-ইসতিযকার ৫/৯৪, ৬। মুস্তাদরাকে হাকেম ২/১৩৬, হাদীস নং ২৫৭৭, কানযুল উম্মাল ১১/১২২, হাদীস নং ৩০৮৬৫ ইত্যাদি, ৭। সহীহে ইবনে খুযইমা ৩/২৬, হাদীস নং১৫৫৭, ৮। বায়হাকী ৪/২৬৮, হাদীস নং ৭৬৬৬, মারাফাতুস সুন্নাহ ওয়াল আসার ৩/৩২১, হাদীস নং ২৪০০, ৯। মুসনাদে আহমদ ৪/২০৫, হাদীস নং ১৭৮২২, ১০। ইবনে মাজাহ ৪/৩ ৪/৩৬৭ হাদীস নং৪০১৯।

পবিত্র কালামুল্লাহ থেকে

উচ্চতর কুরআন গবেষণা বিভাগ
মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

بسم الله الرحمن الرحيم

والعصر ، ان الانسان لفى خسر، الا الذين امنوا وعملوا الصلحت وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر

অর্থ: মহাকালের শপথ, মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে, কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্যধারণে পরস্পরকে উদ্বুদ্ধ করে থাকে।

আসর' শব্দের অর্থ হলো কাল বা সময়। যেই কাল বা সময়ে মানুষ পাপ-পুণ্যের কাজ করে। হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম রা. বলেন, আসর এর অর্থ হলো আসরের নামায বা আসরের নামাযের সময়। কিন্তু প্রথমোক্ত উক্তিটিই প্রসিদ্ধ। উক্ত সময়ের কসমের পর আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, নিশ্চয়ই মানুষ অত্যন্ত ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। কিন্তু যারা ঈমান আনে ও ভাল কাজ করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয়। অর্থাৎ নিজে সৎকাজ করে এবং অন্যকে সৎকাজে উদ্বুদ্ধ করে। বিপদাপদে নিজে ধৈর্যধারন করে এবং অন্যকেও ধৈর্য ধারণের উপদেশ দেয়, জনগণ কষ্ট দিলে ক্ষমার মাধ্যমে ধৈর্যের পরিচয় দেয় এবং ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ হতে বিরত থকার নির্দেশ দিতে গিয়ে যে বাধাবিঘ্ন ও বিপদের সম্মুখীন হয় তাতেও ধৈর্য ধারণ করে, তারা এই সুস্পষ্ট ক্ষতি থেকে মুক্তি পাওয়ার সৌভাগ্যের অধিকার।

বর্ণিত আছে যে, হযরত আমর ইবনে আস রা. মুসলমান হওয়ার পূর্বে একদা মুসাইলামা কাযযাবের সাথে সাক্ষাৎ করেন। ঐ সময় মুসাইলামা নবুওয়াতের মিথ্যা দাবী করেছিল। হযরত আমর (রা) কে সে জিজ্ঞাসা করলো "এখন কি তোমাদের রাসূলুল্লাহ -সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর উপর কোন অহী নাযিল হয়েছে? হযরত আমর রা. জবাবে বলেনঃ "একটি সংক্ষিপ্ত, অলংকারপূর্ণ সূরা নাযিল হয়েছে"। মুসাইলামা জিজ্ঞেস করলোঃ "সেটি কি?" হযরত আমার রা. তখন সূরায়ে "আসর" পাঠ করে শুনালেন। মুসাইলামা কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললোঃ "জেনে রাখ, আমার উপরও এরকম সূরা নাযিল হয়েছে"। হযরত আমর রা. জিজ্ঞেস করলেন: "সেটি কি?" সে তখন বলল: ياوبرياوبر وانما انت اذنان وصدر وسائرك حفرنقر তারপর জিজ্ঞেস করলো: "হে আমর রা. বল তোমার অভিমত কি?" তখন হযরত আমর রা. বললেন: "তুমি তো নিজেই জান যে, তোমার মিথ্যা ও ভণ্ডামী সম্পর্কে আমি অবহিত।" وبر হলো বিড়ালের মত আকৃতি বিশিষ্ট একটা পশু। তার কান দুটি ও বুক কিছুটা প্রশস্ত ও বড়। দেহের অন্যান্য অংশ খুবই নিকৃষ্ট ও বাজে। ভণ্ড, দুবৃত্ত ও মিথ্যাবাদী মুসাইলামা এ রকম বাজে কথাকে আল্লাহ পাকের পবিত্র কালামের সাথে তুলনা করতে চেয়েছিল। তার এ ধরনের ঘৃণ্য ভণ্ডামী দেখে আরবের মূর্তিপুজকরাও তাকে মিথ্যাবাদী এবং ভণ্ড বলে সহজেই বুঝে নিয়েছিল।

দু'জন সাহাবীর অভ্যাস ছিল, যখন তাঁদের পরস্পর সাক্ষাৎ হতো তখন একজন এ সূরাটি পড়তেন এবং অপরজন শুনতেন। তারপর পরস্পর সালাম বিনিময় করে বিদায় নিতেন।

হযরত ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন যে, মানুষ যদি এই একটি মাত্র সূরা চিন্তা ভাবনা ও মনোযোগের সাথে পাঠ করে এবং অনুধাবন করে তবে এই একটি সূরাই তাদের হেদায়তের জন্য যথেষ্ট।

খানেকাহে এমদাদিয়া আশরাফিয়া
আবরারিয়ার
বার্ষিক ইসলাহী ইজতিমা
১৪,১৫,১৬ জানুয়ারী ২০১৩ইং
সোম, মঙ্গল ও বুধবার

স্থান: জামে মসজিদ, মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ বসুন্ধরা, ঢাকা।

পবিত্র সুন্নাহ থেকে

উচ্চতর হাদীছ গবেষণা বিভাগ
মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

মহিলাগণ আপন ঘরেই নামায আদায় করবে

عن ام سلمة رضى الله عنها عن رسول الله ﷺ انه قال: "خير مساجد النساء قعر بيوتهن" (مسند احمد ٦/٢٩٧، رقم الحديث ٢٦٥٩٨)

* হযরত উম্মে সালমা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সঃ) ইরশাদ করেন, মহিলাদের নামাযের উত্তম জায়গা হলো তাদের ঘরের নির্জন কোণ। (মুসনদে আহমদ ৬/২৯৭, হাদীস নং ২৬৫৯৮)

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن النبى ﷺ قال: "ان احب صلاة تصليها المرأة الى الله فى اشد مكان فى بيتها ظلمة" (صحيح ابن خزيمة ٣/٩٦، رقم الحديث ١٦٩١)

* হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সঃ) ইরশাদ করেন, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট মহিলাদের ঐ নামায বেশি প্রিয় যা নির্জন ও অন্ধকার কক্ষে আদায় করা হয়। (ছহীহ ইবনে খুযাইমা ৩/৯৬, হাদীস নং ১৬৯১)

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن النبى ﷺ قال صلاة المرأة فى بيتها افضل من صلاتها فى حجرتها فى مخدعها افضل من صلاتها فى بيتها (سنن ابى داؤد ١/٣٨٣، رقم الحديث ٥٧٠)

* হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. রাসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, মহিলাদের ক্ষুদ্র কক্ষে নামায বড় কামরার নামাযের তুলনায় উত্তম আর ঘরের নির্জন কোণের নামায ক্ষুদ্র কক্ষের নামাযের তুলনায় উত্তম। (আবু দাউদ শরীফ ১/৩৮৩, হাদীস নং ৫৭০)

عن ابن عمر رضى الله عنهما : صلاة المرأة تفضل على صلاتها فى الجمع خمسا وعشرين درجة (الفردوس ٢/٣٨٩ رقم الحديث ٣٧٢٦)

* হযরত ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত আছে যে, মহিলাদের একা নামায পড়া জামাতে নামায পড়ার তুলনায় পঁচিশ গুণ বেশী সাওয়াব। (মুসনাদে ফিরদাউস ২/৩৮৯, হাদীস নং ৩৭৬২)

عن عائشة رضى الله عنها "لو ان رسول الله ﷺ رأى ما احدث النساء بعده لمنعهن المسجد ، كما منعت نساء بنى اسرائيل (الصحيح للامام البخارىؒ ٨٦٩، مسلم شريف ١/١٨٣)

* হুযুর (সঃ) এর ইন্তিকালের পর উম্মুল মু'মিনিন হযরত আয়শা (রা.) বলেন, হুযুর (সঃ) যদি এ পরিস্থিতি (বেপর্দা ভাব) দেখতে পেতেন যা নবীজীর ইন্তিকালের পর মহিলাদের দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে, তাহলে অবশ্যই তিনি মহিলাদেরকে মসজিদে গমণ থেকে নিষেধ করতেন। (বুখারী ৮৬৯, ও মুসলিম শরীফ ১/১৮৩)

এসব ছিল সেই স্বর্ণযুগের কথা। আজ যেহেতু ফেৎনা-ফাসাদ হাজার হাজারগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, এ জন্যই ফেকাহ শাস্ত্রবিদগণ ফতোয়া দিয়েছেন যে, মহিলাদের মসজিদে যাওয়া মাকরুহে তাহরীমি। তা পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্য হোক, অথবা জুমা বা ঈদের নামাযের জন্য হোক।

* হজ্বযাত্রী মহিলাগণ পর পুরুষের ভীড়ে ধাক্কায় না পড়ে নিজ নিজ কামরায় নামায আদায় করে নেওয়াটাই উত্তম।

সম্প্রতি বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে মহিলাদেরকে মসজিদে নামায আদায়ের ব্যাপারে বিভিন্নভাবে উৎসাহ প্রদান করতে দেখা যায়। তা নিশ্চয় মুর্খতা বা কোন অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে করা হচ্ছে। এসকল বিভ্রান্তিমূলক কথা বার্তা শ্রবণ এবং আমল করার ক্ষেত্রে সাধারণ মুসলমানদের সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

দরসে ফিক্বহ

শরীয়া মানদন্ডে মোবাইলের মাধ্যমে বিয়ে

মুফতী শাহেদ রহমানী

আধুনিক যুগে মোবাইল / মুঠোফোন ব্যাপক উপকারী ও সমাদৃত একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার। এখন সব শ্রেণীর মানুষ মোবাইল নির্ভর হয়ে পড়েছে। মোবাইলের ভালো-মন্দ দুটি দিক থাকলেও এই ছোট্ট যন্ত্রটি ছাড়া কারো জীবন যেন চলতে চায় না। এর উপকার নানামুখী, তাই সর্বত্রই এর ব্যবহার লক্ষণীয়। শরীয়তের দিক-নির্দেশনা মোতাবেক সঠিকভাবে এর ব্যবহার হলে নিঃসন্দেহে এটি একটি বড় নেয়ামত হয়ে উঠতে পারে।

ইসলাম এমন একটি ধর্ম, যার মধ্যে সর্বকালে সর্বক্ষেত্রের পথচলার মৌলিক দিক-নির্দেশনা রয়েছে। যত আধুনিক থেকে আধুনিক বিষয় হোক না কেন,ইসলামে তার মৌলিক সমাধান ও পথ নির্দেশনা রয়েছে। মোবাইল আধুনিক যুগের নব-আবিস্কৃত একটি যুগান্তকারী যন্ত্র হতে পারে, কিন্তু যেসব কাজ এর দ্বারা সম্পাদিত হয় তা নতুন কিছু নয়। যেমন ক্রয়-বিক্রয়, বিয়ে-শাদী ইত্যাদি। ইসলামে এসব বিষয়ের বিধি-বিধান সংক্রান্ত বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে। এর মধ্যে যা ইসলামের নির্দেশিত বিধান অনুযায়ী হবে, তা শুদ্ধ ও জায়েয অন্যথায় তা হবে অশুদ্ধ ও নাজায়েয।

বর্তমান সমাজে বিশেষ করে প্রবাসীদের মধ্যে মোবাইলের মাধ্যমে বিয়ে করার প্রবণতা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়ে চলেছে। সমাজে এধরনের বিয়ের ব্যাপারে পক্ষ-বিপক্ষ মত এবং সংশয়ের সৃষ্টি হচ্ছে। ইসলামের দৃষ্টিতে মোবাইলে বিবাহের গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু এবং প্রবাসীদের জন্যে শরীয়ত সম্মত বিবাহের রূপরেখা কি? তথ্যনির্ভর আলোচনা নিয়েই আজকের "দরসে ফিক্বহ"।

মোবাইলে বিয়ে

মোবাইলে বিয়ে বলতে বোঝানো হয় আক্বদের অনুষ্ঠানে কোন কারণে বর-কনের মধ্য হতে কোন একজনের উপস্থিতি সম্ভব না হলে উপস্থিত পক্ষের কোন একজন সাক্ষীগণের সামনে মোবাইলের মাধ্যমে অনুপস্থিত পক্ষকে বিবাহের প্রস্তাব প্রদান করা। অনুপস্থিত পক্ষ সাক্ষীদের কাছ থেকে দূরে বহু দূরে অবস্থান করে অপর প্রান্ত থেকে তা কবুল করে নেয়া।

ইসলামের দৃষ্টিতে মোবাইলের মাধ্যমে সম্পাদিত এ ধরনের বিবাহের হুকুম জানার পূর্বে বর্তমানে ব্যবহৃত মোবাইল সেট ও যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর মৌলিক প্রকারভেদ এবং শরীয়ত মোতাবেক বিবাহ জায়েয হওয়ার শর্তসমূহ জেনে নেয়া জরুরী। যাতে করে এ ধরনের বিবাহের শরয়ী বিধান বুঝা সহজবোধ্য হয়।

মোবাইলের প্রকারঃ

প্রচলিত মোবাইলসেট ও যোগাযোগ মাধ্যমগুলো সাধারণত: চার প্রকার হয়ে থাকে। যথা :

১.এমন সেট যার আওয়াজ শুধুমাত্র ঐ ব্যক্তিই শুনতে পায়, যে রিসিভ করে।

২. লাউড স্পিকারযুক্ত সেট, যার আওয়াজ রিসিভকারী ছাড়াও পাশে অবস্থিত উপস্থিত লোকজনও শুনতে পারে ।

৩. 3g Supporter উন্নত মানের সেট, যেগুলো দ্বারা সরাসরি ভিডিও কল করা যায়। যার মধ্যে একে অপরকে সরাসরি দেখতে পারে এবং কথাও শুনতে পারে। উল্লেখ্য যে, আমাদের দেশের মোবাইল কোম্পানীগুলোর নেটওয়ার্ক এখনও 3g Support করে না। তবে টেলিকনফারেন্স এবং কম্পিউটারে অনলাইনে সরাসরি ভিডিও কল করা যায়। যা উল্লেখিত তৃতীয় প্রকারের অন্তর্ভুক্ত।

৪. বহুল প্রচলিত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, যেগুলোতে

লেখা এবং স্থির ছবি দেখা যায়। কোন ধরনের আওয়াজ শোনা যায় না। যেমন : ফেইসবুক, টুইটারে চ্যাট করা ইত্যাদি।

বিবাহ সহীহ হওয়ার শর্তাবলী :

শরয়ী দৃষ্টিকোণে বিবাহ সহীহ্ হওয়ার জন্য কিছু মৌলিক শর্ত রয়েছে। যেগুলোর কোন একটি শর্তের অনুপস্থিতি শরীয়ত মোতাবেক নিকাহ্ অশুদ্ধ হয়ে যেতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি মৌলিক শর্ত নিম্নরূপ ।

১. বর-কনের ইজাব-কবুল (Offer-Acceptence) দুইজন যোগ্য সাক্ষীর সামনে সম্পাদন হওয়া। ইজাব যে সব সাক্ষীদের সামনে হবে কবুল ঠিক সেই সাক্ষীদের উপস্থিতিতেই হতে হবে।

২. সাক্ষীদ্বয় বর-কনের ইজাব-কবুল সরাসরি শুনতে হবে।

৩. ইজাব ও কবুল একই মজলিসে (বৈঠকে) সম্পাদন হওয়া আবশ্যক।

৪. এবং ইজাব-কবুল উভয় সাক্ষীর একসাথে শুনতে হবে।

وشرط حضور شاهدين حرين او حر وحرتين مكلفين سامعين قولهما معا (الدر المختار ٣/٢٢،٢١)

وفى الهندية ١/٢٢٨ ومنها سماع الشاهدين كلاهما معا

وفى الهداية ٢/٣٠٦ ولا ينعقد نكاح المسلمين الا بحضور شاهدين حرين عاقلين بالغين مسلمين۔

পর্যালোচনা :

উল্লেখিত শর্তগুলোর আলোকে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, আলোচিত যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর কোন একটিতেও বিবাহ সহীহ্ হওয়ার প্রথম শর্তটি পাওয়া যায় না। কারণ, সাক্ষীদের উপস্থিতি কনের সাথে হলে বরের সাথে নেই আর বরের সাথে হলে কনের সাথে নেই। প্রত্যেকের সাথে ভিন্ন ভিন্ন সাক্ষী উপস্থিত থাকলে শরীয়তে তা অগ্রহণযোগ্য।

উল্লেখিত দ্বিতীয় শর্তটি যোগাযোগ মাধ্যমের চতুর্থ প্রকার ছাড়া প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রকারে পাওয়া গেলেও প্রথম শর্তটি না থাকার কারণে তাও অকার্যকর।

তৃতীয় শর্তটি উল্লেখিত যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর কোনটিতে পাওয়া যাওয়া সম্ভব নয়, বিধায় এগুলোর দ্বারা বিবাহ সম্পাদন শরীয়ত মোতাবেক কোনভাবেই শুদ্ধ হবে না।

রয়ে গেল চতুর্থ শর্তটি, এটির অস্তিত্ব শুধুমাত্র দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রকারের যোগাযোগ মাধ্যমে পাওয়া যায়। তবে এটিও অর্থহীন হয়ে যায় উল্লেখিত প্রথম ও তৃতীয় শর্তটির অনুপস্থিতির কারণে ।

প্রথম প্রকারের মোবাইলে সাক্ষীগণের পক্ষে পর্যায়ক্রমে ইজাব-কবুল শুনা সম্ভব হলেও সবার পক্ষে একসাথে শুনা অসম্ভব। আর চতুর্থ প্রকারের বিষয়টি স্পষ্ট।

وفى الشامية ٣/٢٣ وخرج بقوله معا ما لو سمعا متفرقين بان حضر احدهما العقد ثم غاب واعيد بحضرة الاخر او سمع احدهما فقط العقد فاعيد فسمعه الاخر دون الاول او سمع احدهما الايجاب والاخر القبول ثم اعيد فسمع كل وحده مالم يسمعه اوّ لا لان فى هذه الصورة وجد عقدان لم يحضر كل واحد منهما شاهدان كما فى شرح النقاية۔

وفى الهندية ١/٢٦٨ ولو سمعا كلام احدهما دون الاخر او سمع احدهما كلام احد هما والاخر كلام الاخر لايجوز النكاح هكذا في البدائع ٢/٢٥٥

উল্লেখিত পর্যালোচনার দ্বারা এই কথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, উল্লেখিত প্রথম তিন প্রকারের মোবাইলের মাধ্যমে সম্পাদিত বিয়ে শরীয়তের বিধানানুযায়ী অশুদ্ধ এবং নাজায়েয প্রথম ও তৃতীয় শর্তটির অনুপস্থিতির কারণে।

আর চতুর্থ প্রকার যোগাযোগ মাধ্যমে বিবাহ জায়েয না হওয়ার কারণ সবকটি শর্তের অনুপস্থিতি।

বিকল্প পন্থা:

প্রশ্ন থেকে যায়, প্রবাসী বা যারা বিবাহের আক্বদের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে অপারগ, শরীয়ত তাদের জন্য বিবাহের পথ বন্ধ করে দিয়েছে? নাকি বিকল্প কোন পথ খোলা রেখেছে?

অবশ্যই, শরীয়ত তাদের জন্য একটি নয় একাধিক পথ উন্মুক্ত রেখেছে। যার নিকট যেটি সহজ এবং বোধগম্য সেটি সে অবলম্বন করতে পারবে। গায়েবানা বিয়ের

কয়েকটি পদ্ধতি নিম্নে প্রদত্ত হলো।

১.বর বিবাহের প্রস্তাব দিয়ে কনেকে/কনের নিযুক্ত উকিলকে চিঠি লিখবে। চিঠি কনের/কনের নিযুক্ত উকিলের হস্তগত হলে শরীয়ত সম্মত সাক্ষীদের সামনে ঐ চিঠি পাঠ করা হবে। পাঠ শেষে কনে/নিযুক্ত উকিল ঐ মজলিসেই বলবে যে, আমি/ কনের পক্ষে আমি বিবাহ কবুল করলাম। তাহলে বিবাহ সম্পন্ন হয়ে যাবে।

২. কনে বিবাহের প্রস্তাব দিয়ে বরকে/বরের নিযুক্ত উকিলকে চিঠি লিখবে। চিঠি বরের/বরের নিযুক্ত উকিলের হস্তগত হলে শরীয়ত সম্মত সাক্ষীদের সামনে ঐ চিঠি পাঠ করা হবে। পাঠ শেষে বর/নিযুক্ত উকিল ঐ মজলিসেই বলবে যে, আমি/ বরের পক্ষে আমি বিবাহ কবুল করলাম। তাহলে বিবাহ সম্পন্ন হয়ে যাবে।

৩. প্রবাসীরা দেশে অবস্থিত কাউকে নিজের বিবাহের উকিল নিযুক্ত করে তাকে বলে দিবে যে, "অমুক মেয়ের সাথে তুমি আমার বিবাহ সম্পাদন করে দাও" এর পর উক্ত উকিল দুইজন শরীয়ত সম্মত সাক্ষীর সামনে নিজ মুয়াক্কিলের পক্ষ থেকে সরাসরি কনের সাথে বা কনের পক্ষ থেকে নিযুক্ত উকিলের সাথে ইজাব-কবুল করে নিবে।

৪. অথবা চিঠি বা মোবাইলের মাধ্যমে বর, কনেকে বা কনে, বরকে নিজের বিয়ের উকিল নিযুক্ত করবে। তখন উকিল বর হোক বা কনে শরীয়ত মোতাবেক সাক্ষীদের সামনে বলবে যে, তোমরা সাক্ষী থাকো আমি আমার মুয়াক্কিল অমুকের বিবাহ আমার সাথে সম্পাদন করলাম।

তাহলে বিবাহ সম্পন্ন হয়ে যাবে।

الدر المختار ٣/٩٦ (ويتولى طرفى النكاح واحد) بايجاب يقوم مقام القبول فى خمس صور كان وليا او وكيلا من الجانبين او اصيلا من جانب ووكيلا اوولیا من اخر او وليا من جانب وكيلا من اخر كزوجت بنتى من موكلى،

وفى الدر المختار ٣/١٢ ولا بكتابة حاضر بل غائب بشرط اعلام الشهود بما فى الكتاب مالم يكن بلفظ الامر فيتولى الطرفين۔

وفى الشامية ٣/١٢ (قوله بل غائب) الظاهر ان المرادبه الغائب عن المجلس وان كان حاضرا فى البلد (قوله فتح) فانه قال ينعقد النكاح بالكتاب كما ينعقد بالخطاب وصورته: ان يكتب اليها يخطبها فاذا بلغها الكتاب احضرت الشهود وقراته عليهم وقالت زوجت نفسى منه او تقول ان فلانا كتب الى يخطبنى فاشهدوا انى زوجت نفسى منه امالولم تقل بحضرتهم سوى زوجت نفسى من فلان لا ينعقد لان سماع الشطرين شرط صحة النكاح۔

وفى فتح القدير ٣/١٨٩ ينعقد النكاح بالكتاب كما ينعقد بالخطاب وصورته ان يكتب الخ ، واما فى حال غيبة احد العاقدين عن الاخر والتعاقد بطريق الكتابة او الرسالة فقال الحنفية مجلس عقد الزواج : هو مجلس قراءة الكتاب امام الشهود او سماع رسالة الرسول بحضرة الشهود فعندئذيتحد المجلس (الفقه الاسلامى وادلته ٧/٥٠) وفى فتاوى رحيمية ٣/١٣١، ١٣٢، وفتاوى عثمانى ٢/٣٠٤، ٣٠٥)

প্রবাসীদের জন্য উপরে উল্লেখিত চারটি পদ্ধতির যেকোন একটি অবলম্বন করার অনুমতি রয়েছে। তবে তৃতীয় পদ্ধতিটি আমাদের দেশের সমাজের জন্য মানানসই।

বন্দরনগরী চট্টগ্রাম শহরস্থ ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি শিক্ষাকেন্দ্র

জামি'আ মাদানিয়া শুলকবহরের

বার্ষিক সভা

তারিখ: ২৯, ৩০ নভেম্বর ২০১২ইং

রোজ: বৃহস্পতি ও শুক্রবার

সকলের প্রতি দ্বীনি দাওয়াত রইল।

প্রচারে: জামি'আ কর্তৃপক্ষ

হযরত ওয়ালা ফক্বীহুল মিল্লাত দা: বা: এর
ইরশাদসমূহ

(হযরত ওয়ালা ফক্বীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান দামাত বারাকাতুহুম বসুন্ধরা মারকাযের জামে মসজিদে ছাত্র-শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে দেয়া সমসাময়িক বিভিন্ন মালফুজাত থেকে সংগৃহীত)

* হযরত মাওলানা কাসেম নানুতভী রহ. এর ইন্তিকালের পর দারুল উলূম দেওবন্দের মজলিসে শূরা গঠিত হয়। প্রথম পৃষ্ঠপোষক নির্বাচিত হন হযরত গাঙ্গুহী রহ.। সে সময় দেওবন্দবাসীরা এক জমিদার লোককে শূরার সদস্য মনোনীত করার জন্য অপচেষ্টা চালায়। তখন মুহতামিম ছিলেন হযরত মাওলানা হাবীবুর রহমান উসমানী রহ. যিনি "লামিয়াতুল মু'জেযাত"সহ বিভিন্ন কিতাবের লেখক। তিনি এলাকাবাসীর এই ফিৎনা থেকে মাদরাসাকে রক্ষা করার জন্য হযরত হাকীমুল উম্মত রহ. এর মাধ্যমে হযরত গঙ্গুহী রহ. এর কাছে একটি সুপারিশ লিখিয়ে নিলেন। হযরত গঙ্গুহী রহ. বললেন, দেওবন্দ মাদরাসা থাকুক আর না থাকুক আমি এই না আহাল বা অযোগ্যকে শূরা সদস্য মনোনীত করতে পারব না। কারণ কিয়ামতের দিন এই প্রশ্ন করা হবে না কেন দেওবন্দ মাদরাসা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল? কিন্তু অবশ্যই এই প্রশ্ন করা হবে কেন তুমি না আহালকে শূরার রুকন বানিয়েছিলে?

* অন্তরে পুরোপুরি একীন করে সূরা ওয়াকিয়া পড়তে থাক। খাওয়ার ব্যবস্থা আল্লাহ তা'আলা করে দিবেন।

* حديث ضعيف এর মর্ম হল এ'তেকাদ সহীহ হাদীস এর দরজার বা মানের হবে না তবে আমলের জন্য গ্রহণযোগ্য। ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত ও মুস্তাহাবের উপর আমল করা। কিন্তু মুস্তাহাবকে ফরজ মনে করা যাবে না। অন্যথায় মুস্তাহাব ওয়াজিবে পরিণত হয়ে যায়।

* যদি সম্ভব হয় চাঁদা তোলা থেকে বেঁচে থাক। হযরত হাজী ইউনুস সাহেব হুজুর রহ. এর সাথে পটিয়া মাদরাসার জন্য মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফ যেতাম, চাঁদা কালেক্ট করার জন্য। ১৯৭৯ঈসায়ী সনে মুলতাযাম-এ দু'আ করলাম, ইয়া আল্লাহ! মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফে আমাকে চাঁদা ছাড়া অন্যান্য মাকসাদে নিয়ে এসো। দু'আ কবুল হল। তবে দু'আ অসম্পূর্ণ ছিল, কবুল হল তা-ই। অত:পর চাঁদা সংগ্রহের জন্য দুবাই যেতে হল। এ সিলসিলা চলতে থাকল। আলহামদু লিল্লাহ হযরত ওয়ালা হারদূয়ী রহ. এর উসিলা ও দিকনির্দেশনায় চাঁদা সংগ্রহের কাজ থেকে মুক্ত হওয়ার তাওফীক হল।

* বুখারী শরীফে বাইআতের বিভিন্ন প্রকারের কথা আছে। হযরত উবাদা ইবনে সামেত রা. এর হাদীসে চুরি, গীবত, যিনা ও তুহমত (অপবাদ দেয়া) ইত্যাদি থেকে বেঁচে থাকার ও ভাল কাজ করার উপর বায়আত গ্রহণের কথা এসেছে।

* যারা বলেন পীর তালাশ করে পাওয়া গেল না। তাদের কাছে জিজ্ঞাসা, উস্তাদ কিভাবে পেলেন? হযরত মাদানী রহ., শায়খুল হিন্দের মত মুহাদ্দিস কোথায় পাবেন? তাঁদের মত উস্তাদ কোথায় পাবেন? তারপরওতো লেখা পড়া বাদ দেননি। এখন কেন পীরের কাছে বাইআত হওয়া বাদ দিবেন। হযরত মাওলানা হাকীম আখতার সাহেব দা. বা. বলেন, কিয়ামত পর্যন্ত সাদেক্বীন / আল্লাহ ওয়ালাগণ থাকবেন, অন্যথায় تكليف ما لا يطاق (সাধ্যবহির্ভুত কাজের হুকুম দেয়া) হবে। শারীরিক রোগ ব্যাধির জন্য বর্তমান ডাক্তারদের থেকে নির্বাচন করে থাকেন। তদ্রুপ রূহানী আমরায (আত্মার ব্যাধি) এর জন্যও বর্তমান রূহানী ডাক্তারদের থেকেই নির্বাচন করবেন। হযরত থানভী রহ. বলেন, এক জিসমানী ডাক্তারের কাছে ফায়দা না হলে অন্য ডাক্তার নির্বাচন করা হয়। তদ্রুপ রূহানী ডাক্তারের বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য। তবে প্রথম চিকিৎসকের সমালোচনা করা যাবে না।

* বায়আতের উপকারিতা হলো ১. আল্লাহ ওয়ালার হাতে তাওবা করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। ২. ভবিষ্যতে গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার ওয়াদা হয়। সে ক্ষেত্রে মুরীদ সাহস করে গোনাহ থেকে বেঁচে আপন জিম্মাদারী আদায়

করবে আর শায়খ দু'আ করত: স্বীয় দায়িত্ব আদায় করবে। ৩. যেহেতু মাশায়েখদের সিলসিলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছে সেহেতু বায়আতের মাধ্যমে সিলসিলায় দাখেল (প্রবেশ) হলে তরীকতের মাশায়েখ এর রূহানী তাওয়াজ্জুহাত অর্জন হয়। মৃত কলবকে জীবিত কলবের সাথে সম্পৃক্ত করে দাও, ইনশাআল্লাহ মৃত কলবও জীবিত হয়ে যাবে।..... যেমন দুর্ঘটনা কবলিত গাড়ীকে অন্য ভাল গাড়ীর সাথে বেঁধে দেয়া হয় তখন ঐ নষ্ট গাড়ীও সাথে সাথে চলতে থাকে। তবে এর জন্য চারটি বিষয় আবশ্যক। ক. সর্বদা আল্লাহপাকের যিকিরে থাকা, সকল কাজে আল্লাহর স্মরণ রাখা। খ. গোনাহসমূহ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করা। গ. আল্লাহ-ওয়ালাদের সাথে উঠাবসা করা। ঘ. রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণ করা। যে কোন আমল সুন্নাত মতে হলে যিকিরে গণ্য হয়। ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত হয়। এমনকি সুন্নাত তরীকায় ইস্তিঞ্জা করলেও।

* সুদের টাকা দিয়ে দ্বীনি মাদরাসার টয়লেট তৈরী করা যাবে না। সুদের টাকা তো সাওয়াবের নিয়ত না করে গরীব ফাসেক ও জাহেলদের জন্য খরচ করা যেতে পারে। আহলুল্লাহদের জন্য নয়। আর যদি দ্বীনি মাদরাসা ওয়ালারা আল্লাহ ওয়ালা না হন তবে কে বা আল্লাহ ওয়ালা হবে? পটিয়া মাদরাসার হাম্মামখানা তৈরী করার জন্য জনৈক ব্যবসায়ী সুদের টাকা প্রদান করতে চাইলে আমি স্পষ্ট বলে দিয়েছিলাম, আমি এটাকে না জায়েয মনে করি, নিতে পারব না।

* ডান পাশে চলা আমলী যিকির। সুবহানাল্লাহ বলা মৌখিক যিকির আর এর সাথে কলব মনোযোগী হলে যিকিরে কলবী হবে।

* গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা মুশকিল হয়ে গেছে। বিশেষ করে বদনজরীর গোনাহ। তাফসীরে রূহুল মা'আনীর মুসান্নিফ আল্লামা আলূসী রহ. বলেন, গোনাহের পরিবেশের সম্মূখীন হলে বেশী বেশী امنت بالله ورسوله পড়বে। বদনজরীর সম্ভাবনা হলেই ধ্যানমগ্ন হয়ে এই দুআ পড়বে। এটি বুজুর্গানে দ্বীনের পরীক্ষিত আমল।

* হযরত থানভী রহ. বলেন গোনাহের চাহিদাটাও ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় যদি গোনাহ থেকে বাঁচা যায়।

* গোনাহ দু'ধরনের। ১. প্রকাশ্য ২. অপ্রকাশ্য। শেষোক্ত গোনাহে বেশি পতিত হয়। গোনাহকে গোনাহ মনে করা হলে তাওবার আশা করা যায়। কিন্তু গোনাহ-ই মনে করা না হলে, তাওবাও নসিব হয় না।

* পটিয়া মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মুফতী আযীযুল হক্ব রহ. সংশ্লিষ্ট ওলামায়ে কেরামকে দু'টি নসীহত করতেন। ক. অন্তর চায় আমার সংশ্লিষ্টগণ মুহতামিম না হোক। খ. যদি বাধ্যবশত হতেই হয়, তখন যেন টাকা পয়সা থেকে দূরে থাকে। অর্থাৎ নিজের কাছে না রাখে।

* মুসলমানদের সন্তান সন্ততি যারা মাদরাসায় পড়তে আসে তারা মুহতামিম ও আসাতিযায়ে কেরামের কাছে আমানত। মুসলমানদের দানের টাকা পয়সাও আমানত। এই আমানতদ্বয়ের হিসাব আল্লাহ তা'আলার কাছে দিতে হবে।

* হযরত থানভী রহ. বলেন মুরীদদের তিনটি স্তর ১. কামেল হওয়ার পর খেলাফতপ্রাপ্ত হওয়া ২. কামেল না হয়ে খেলাফতপ্রাপ্ত হওয়া, তবে মেহনত করতে করতে কামেল হওয়ার পূর্ণ আশা থাকা। ৩. সাধারণ মুরিদগণ। প্রথম স্তরের জন্য নসীহত হল শায়খের সোহবতে আসা যাওয়া করা। শায়খের ইন্তিকালের পর অন্য কোন আল্লাহ ওয়ালার সাথে ইসলাহী সম্পর্ক রাখা। বড় কেউ না থাকলে ছোটদের (শিষ্য/খলীফাদের) সাথে মশওয়ারা করা। হযরত মাওলানা আবরারুল হক্ব সাহেব হারদূয়ী রহ. নিজ শায়খ হযরত থানভী রহ. এর ইন্তিকালের পর ইসলাহী সম্পর্ক রাখেন হযরত খাজা আজীজুল হাসান মযজুব রহ. এর সাথে। মুফতী শফী সাহেব রহ.সহ হযরত থানভী রহ. হযরত থানভী রহ. এর বড় বড় খলীফাগণ হযরতের ইন্তিকালের পর হযরত খাজা সাহেব রহ. এর সাথে ইসলাহী সম্পর্ক রাখেন। হযরত খাজা সাহেব ইন্তিকাল করার পর হারদূয়ী হযরত ইসলাহী সম্পর্ক রাখেন হযরত মাওলানা শাহ ওয়াসিয়্যুল্লাহ রহ. এর সাথে। তাঁর ইন্তিকালের পর সম্পর্ক রাখেন হযরত মাওলানা শাহ আব্দুল গণী ফুলপুরী রহ. এর সাথে।

গ্রন্থনায়: মাওলানা লোকমান

উস্তাদ: মদীনাতুল উলূম মাদরাসা, ঢাকা।

চেয়ারে বসে নামায আদায় প্রসঙ্গে
(দারুল উলূম দেওবন্দের ফতওয়া)

ভাষান্তরঃ মুফতী এনামুল হক কাসেমী

সম্প্রতি দেখা যায় মসজিদে মসজিদে চেয়ারের সংখ্যা বেড়েই চলছে, সাথে সাথে বেড়ে চলছে চেয়ারে বসে নামায আদায়কারীর সংখ্যাও। হাঁটু, কোমর বা শরীরের অন্য কোন অঙ্গে সামান্য ব্যথা অনুভব করে ডাক্তারের কাছে পরামর্শ নিতে গেলে ডাক্তার সাহেব বলে দেন আপনি নামাযী ব্যক্তি হলে চেয়ারে বসে নামায পড়বেন। বেশি উঠাবসা করলে ব্যথা বৃদ্ধি পেতে পারে। বেচারা রোগী মানুষ, করবেও বা কি? এসব কারণে সামান্য ব্যথা হলেই এখন চেয়ারে বসে নামায পড়ার প্রবণতা বেড়েই চলছে। এ কারণে প্রায় মসজিদে চেয়ারও সংযুক্ত হচ্ছে কল্পনাতীত ভাবে। কাতারের মাঝখানে বা পার্শ্বে চেয়ার স্থাপন করার কারণে বিভিন্নভাবে মুসল্লীদের কাতারে যে মিলে দাঁড়ানোর কথা তাতেও অনিয়ম দেখা দেয়। আবার কিছু লোক নিচে উপবিষ্ট, কিছু চেয়ারে, তাতেও কেমন যেন অসামঞ্জস্যতা দেখা দেয়। যাতে করে মসজিদের যে পরিবেশ তাতে ব্যঘাত সৃষ্টি হয়। এধরনের আরো বহু কারণে মুসলমানগণ উৎসুক হয়ে উঠেছেন চেয়ারে বসে নামায পড়ার ক্ষেত্রে শরীয়তের নীতি কি, তা জানতে।

এমনি একজন উৎসুক ব্যক্তি উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের দারুল উলূম দেওবন্দের ফতওয়া বিভাগে এ ব্যাপারে একটি ইস্তিফতা করেছেন বা ফতওয়া চেয়েছেন। দারুল উলূম দেওবন্দের কেন্দ্রীয় দারুল ইফতার পক্ষ থেকে কয়েক পৃষ্ঠার একটি নিবন্ধ লিখে এই প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়েছে। যা তাদের অনলাইন ফতওয়ায় প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতেও জানার দাবী রাখে, সে কারণে আমি উক্ত ফতওয়াটি বাংলায় অনুবাদ করার প্রয়াস পাই।

(অনুবাদক)

বরাবর
মুফতী সাহেব
দারুল উলূম দেওবন্দ
ইউপি, ইন্ডিয়া।

শহরের বিভিন্ন মসজিদে অক্ষম ব্যক্তির (যেমন পায়ে ব্যথা, হাঁটু, কোমর ব্যথা, বা দাঁড়াতে পারে না অথবা রুকু সিজদা করতে পারে না অথবা অন্য কোন কারণে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে পারে না এমন ব্যক্তি) জন্য কাতারের উভয় পার্শ্বে বেশ কিছু চেয়ার রেখে দেওয়া হয়। যাতে অক্ষম ব্যক্তিরা বসে নামায আদায় করতে পারেন। সেরূপ আমাদের মসজিদেও চেয়ারের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তবে চেয়ারগুলোও বিশেষ ডিজাইনে নির্মিত। কেউ কেউ বলছেন এমন চেয়ারে বসে নামায আদায় করলে নামায আদায় হবে না।

এখানে প্রশ্ন হলো এরূপ বিশেষ ডিজাইনের কুরসী বা চেয়ারের উপর উল্লেখিত অক্ষম ব্যক্তির নামায জায়েয হবে কি না? নাকি প্লাস্টিকের চেয়ারে নামায আদায় করতে হবে। বিশেষ ডিজাইনের যে চেয়ারগুলোর কথা আমি বলছি, সেগুলো স্টিলের তৈরী। অধিক জ্ঞাতার্থে চেয়ারে নামায আদায়ের চিত্র পাঠাচ্ছি।

যাতে নামাযের পদ্ধতি বুঝতে সমস্যা না হয়। ১নং ছবিটি সিজদা অবস্থায়। এখানে পুরোপুরি সিজদা চেয়ারের উপরই করা হচ্ছে। ২নং ছবিও সিজদাবস্থার। কিন্তু তাতে সিজদা ইশারা করেই করা হচ্ছে। ৩নং ছবিটি রুকু অবস্থার। এখানে এক প্রকার রুকু হলো হাত হাটুর উপর রাখা হয়েছে। আরকটি হলো হাত কাঠের উপর রাখা হয়েছে। এর কোনটি শুদ্ধ? আপনাদের কাছে জানতে চাই যে, বিশেষ ডিজাইনের চেয়ারের উপর নামায আদায় করা কি জায়েয যা স্টিল দ্বারা তৈরী? আর প্লাস্টিক চেয়ারে নামায আদায়ের কি হুকুম? নামায আদায় হবে কি না। অর্থাৎ রুকু-সিজদা কিভাবে আদায় করবে? ছবিতে রুকু-সিজদার যে পদ্ধতি দেখানো হয়েছে এই পদ্ধতিতে রুকু-সিজদা করলে নামায আদায় হয়ে যাবে কি না? কুরআন হাদীছের দৃষ্টিতে ফক্বীহগণের স্বীকৃত মতানুসারে জবাব দিয়ে বাধিত করবেন।

নিবেদক
আফাক আহমদ খান
মোম্বাই।

الجواب وبالله التوفيق

উত্তরঃ

দাঁড়াতে ও সিজদা করতে সক্ষম এমন ব্যক্তির জন্য নামাযে কিয়াম বা দাঁড়ানো ফরজ এবং নামাযের একটি রুকন। যদি দাঁড়ানো এবং সিজদা দানে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও ফরজ নামায বসে আদায় করা হয়, তবে নামাযের ফরজ বা রুকন ছেড়ে দেওয়ার কারণে নামায হবে না। নামায পুনরায় পড়তে হবে।

من فرائضها القيام فى فرض لقادر عليه وعلى السجود

(দুররে মুখতার যাকারিয়া বুকডিপো২/১৩২)

এমনকি যদি নামাযের কিছু অংশ দাঁড়াতে সক্ষম, পুরো সময় দাঁড়িয়ে থাকতে অপারগ, তবে যেটুকু সময় দাঁড়াতে পারবে তা কোন লাঠি বা দেওয়ালের সাথে ঠেস দিয়ে হলেও সেটুকু দাঁড়ানো ফরজ। এমতাবস্থায় যদি না দাঁড়ায় এবং কোন কিছুর উপর হেলান দিয়ে দাঁড়ানোর পরিবর্তে বসেই নামায আদায় করে, তবে নামায হবে না।

وان قدر على بعض القيام ولو متكئا على عصا او حائط قام لزوما بقدر ما يقدر ولو قدر آية او تكبيرة على المذهب لان البعض معتبر بالكل

(দুররে মুখতার ২/২৬৭)

যদি কোন লোক দাঁড়াতে সক্ষম কিন্তু রুকু-সিজদা বা শুধু সিজদা করতে সক্ষম নয়, তার জন্য বসে নামায আদায় করা জায়েয।সে ইশারার মাধ্যমে রুকু-সিজদা করবে। এমতাবস্থায় দাঁড়িয়ে নামায আদায় করার চেয়ে বসে ইশারার মাধ্যমে নামায আদায় করা উত্তম।

وان تعذرا ليس تعذرهما شرطا بل تعذر السجود كاف لا القيام او ما قاعدا لان ركنية القيام للتوصل الى السجود فلا يجب دونه۔

(দুররে মুখতার ২/৫৬৭)

ফতওয়া আলমগীরী ১/১৩৬ তেও এরূপ রয়েছে।

যে সকল অক্ষমতার কারণে দাঁড়ানোর আবশ্যিকতা রহিত হয়ে যায় তা দুপ্রকার:

১। হাকীকী বা মৌলিক : এমন অক্ষম, যে দাঁড়াতে পারবে না।

২। হুকমী বা বিধানগত: এমন অক্ষম নয় যে, দাঁড়ানো সম্ভব না বরং দাঁড়ালে পড়ে যাওয়ার আশংকা অথবা এমন দূর্বলতা থাকে যা শরীয়তের দৃষ্টিতে অক্ষমতা বলে বিবেচিত, যেমন অসুস্থতা, যার ব্যাপারে অভিজ্ঞ মুসলিম ডাক্তাররা পরামর্শ দেন যে, দাঁড়ালে রোগ বৃদ্ধি পাবে, অথবা সুস্থতা ফিরে আসতে বিলম্ব হবে, অথবা দাঁড়ানোর কারণে অসহনীয় ব্যথা অনুভূত হয়, এসকল অবস্থাতে বসে নামায আদায় করা জায়েয।

من تعذر عليه القيام لمرض حقيقى وحده ان يلحقه بالقيام ضرر وفى البحر اراد بالتعذر التعذرالحقيقى بحيث لو قام سقط او حكمى بان خاف اى غلب على ظنه بتجربة سابقة او اخبار طبيب مسلم حاذق زيادته او بطئ برء ه بقيامه او دوران راسه او وجد لقيامه ألما شديدا صلى قاعدا۔

(দুররে মুখতার মাআ রদ্দুল মুহতার ২/৫৬৫)

যদি অসহনীয় ও অস্বাভাবিক ব্যথা না হয় বরং সামান্য ব্যথা অনুভব হয় তবে তা শরীয়তের দৃষ্টিতে অক্ষমতা বলে বিবেচিত হবে না। এমতাবস্থায় বসে নামায আদায় করা জায়েয নেই।

وان لم يكن كذلك (اى بما ذكر) ولكن يلحقه نوع مشقة لايجوز ترك القيام (তাতারখানিয়া -যাকারিয়া বুকডিপো- ২/৬৬৭)

যে লোক দাঁড়াতে অক্ষম, কিন্তু মাটিতে বসে সিজদার সাথে নামায আদায় করতে সক্ষম, তবে তাকে মাটিতে বসে সিজদাসহকারে নামায আদায় করতে হবে। মাটিতে সিজদা না করে চেয়ারের উপর বসে বা মাটিতে বসে ইশারা করে নামায আদায় করা জায়েয হবে না।

وان عجز عن القيام وقدر على القعود: فانه يصلى المكتوبة قاعدا بركوع وسجود ولا يجزيه غير ذلك۔ (তাতারখানিয়া -যাকারিয়া বুকডিপো- ২/৬৬৭)

যদি রুকু ও সিজদা করতে অপারগ, কিন্তু মাটিতে বসে ইশারা করে নামায আদায় করতে সক্ষম, তবে তাশাহহুদ অবস্থার ন্যায় বসা আবশ্যক নয়। বরং যে কোন ভাবেই চাই মহিলাদের তাশাহহুদে বসার মত বা যে আসনে বসলে আরাম হয়, সেভাবেই মাটিতে বসে ইশারা করে নামায আদায় করবে। চেয়ারে বসা উচিৎ নয়। কারণ শরীয়ত এমন অপারগদেরকে মাটিতে বসার ব্যাপারে পূর্ণ ছাড় দিয়েছে, যে আসনে সম্ভব হয় সেভাবেই বসে নামায আদায়

করবে।

من تعذر عليه القيام لمرض ـــ او خاف زيادته ـــ اووجد لقيامه المشديدا صلى قاعدا كيف شاء۔

(দুররে মুখতার মাআ শামী ২/৫৬৬)

এমতাবস্থায় প্রয়োজন ছাড়া চেয়ারে বসে নামায আদায় করলে কয়েকটি কারণে মাকরুহ হবে।

১। মাটিতে বসা সুন্নাত। এ পদ্ধতিতেই সাহাবায়ে কেরাম এবং পরবর্তী মুসলমানদের আমল চলে আসছে। ৯০দশকের পূর্বেপর্যন্ত চেয়ারে বসে নামায আদায় করার প্রচলন ছিল না। না খাইরুল কুরুন তথা ইসলামের সোনালি যুগে এর কোন নজির পাওয়া যায়।

২। চেয়ার ব্যবহারের কারণে নামাযের কাতারে অনেক ফাঁকা রয়ে যায়। অথচ এত্তেসালে সফ তথা কাতারে পরস্পর মিলে দাঁড়ানোর ব্যাপারে হাদীছে তাগিদ দেয়া হয়েছে।

قال النبى ﷺ راصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالاعناق فوالذى نفس محمد بيده انى لارى الشياطين تدخل من خلل الصف كانها الخذف (نسائى ١/١٣١)

৩। প্রয়োজন ছাড়া চেয়ার মসজিদে নেয়ার কারণে বিধর্মীদের উপাসনালয়ের সাদৃশ্যতা দেখা দেয়, অথচ দ্বীনি কাজে অন্যদের সাদৃশ্য গ্রহণ নিষেধ।

৪। নামায হলো বিনয় ও নম্রতার বহিঃপ্রকাশ, প্রয়োজন ছাড়া চেয়ার ব্যবহার করার চেয়ে মাটিতে নামায আদায় করলে বিনয় ও নম্রতা পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ পায়।

৫। মাটির নিকটবর্তী হওয়া নামাযের একটি কাম্য বিষয়, যা চেয়ারের উপর আদায় করলে পাওয়া যায় না।

যদি কোনভাবেই মাটিতে বসে নামায আদায় করার সাধ্য ও সামর্থ না থাকে, তবে প্রয়োজনের ভিত্তিতে চেয়ারে বসে নামায আদায় করা যাবে। কিন্তু যদি যে কোনভাবে মাটিতে বসে রুকু-সিজদা করার সামর্থ থাকে, তবে চেয়ারে নামায আদায় করা জায়েয হবে না।

যে ক্ষেত্রে জরুরতের কারণে চেয়ারে বসে নামায আদায় করার অনুমতি রয়েছে,সে ক্ষেত্রে সিজদার সময় ইশারার উপরই ক্ষান্ত হওয়া উচিৎ। চেয়ারের কোন অংশ যেমন কোন কাঠের উপর সিজদা করার তথা অক্ষম অবস্থায় কোন উঁচু বস্তুর উপর সিজদা করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। যেমন একদা নবী করীম (সা) কোন সাহাবীর শুশ্রূষা করতে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। ঐ সাহাবী অক্ষমতার কারণে একটি বালিশের উপর সিজদা আদায় করছিলেন। নবী করীম (সা) তাঁকে সেরূপ করা থেকে বারণ করতে গিয়ে বলেছেন যদি মাটিতে সিজদা করা তোমার জন্য অসম্ভব হয় তবে ইশারা করে নামায আদায় করবে এবং সিজদার মধ্যে রুকু অপেক্ষা সামান্য বেশি ঝুঁকবে। এ হাদীসটি মুসনাদে বাযযারে বর্ণিত। এর বর্ণনাকারীগণ সহীহ হাদীছের বর্ণনাকারী। (এ'লাউসসুনান ৭/১৭৮)

আরেক বর্ণনায় আছে উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা) অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁর সামনে একটি বালিশ আনা হলো। এর উপর তিনি সিজদা করতেন। নবী করীম (সা) এটি দেখেছেন, কিন্তু নিষেধ করেননি। নবী করীম (সা) কর্তৃক কোন আমল দেখে চুপ থাকাটা অনুমতির প্রমাণ বহন করে।

আল্লামা শামী (রহ) উভয় বর্ণনার মধ্যে এভাবে সামঞ্জস্য বর্ণনা করেছেন, নামায আদায় কালে কোন বস্তু উঠিয়ে তার উপর সিজদা করা মাকরূহ। কিন্তু যদি মাটিতে পূর্ব থেকে কোন বস্তু স্থাপিত থাকে এবং নামায আদায়কারী এর উপর সিজদা করে তবে তা মাকরূহ হবে না।

اقول: هذا محمول على ماذا كان يحمل الى وجهه شيئا يسجد عليه، بخلاف ما اذا كان موضوعا على الارض وقال بعد اسطر: بان مفاد هذه المقابلة والاستدلال عدم الكراهة فى الموضوع المرتفع (شامى ٢/٥٦٨)

আল্লামা চিলপী (রহ)-ও এরূপ বলেছেন। (হাশিয়ায়ে চিলপী আলাত তাবঈন ১/২০০ পাকিস্তানী সংস্করণ) ফতওয়ায়ে আলমগীরীতেও উক্ত সামঞ্জস্যতার(তাতবীক) বর্ণনা পাওয়া যায়।

উক্ত আলোচনার সার কথা হলো, কোন পূর্ব স্থাপিত উঁচু বস্তুর উপর সিজদা করা অথবা সিজদার জন্য কোন বস্তু রাখা ছাড়া ইশারা করে নামায আদায় করা উভয়টিই জায়েয। কিন্তু উল্লেখিত টেবিল সংযুক্ত চেয়ারে সিজদা করলে তাও মূল সিজদা হবে না বরং ইশারার মতই হবে। সুতরাং সেরূপ কুরসির

উপর বসে নামায আদায়কারী ব্যক্তি যদি ইমামতি করে তবে তার পেছনে রুকু-সিজদাকারী মুসল্লীর নামায হবে না।

আল্লামা শামী (রহ) লেখেন :

ان كان الموضع مما يصح السجود عليه كحجر مثلا ولم يزد ارتفاعه على قدر لبنة او لبنتين فهو سجود حقيقى فيكون راكعا ساجدا وان يكن الموضوع كذلك يكون مومئا فلا يصح اقتداء القائم به (شامى زكريا بكڈپو : ٢/٥٦٩)

কিন্তু নবী করীম (সা) এবং সাহাবায়ে কেরাম বারণ করার কারণে তা (উঁচু বস্তুতে সিজদা করা) অনুত্তম বলেই মনে হয়। তাছাড়া যারা নিয়মিত চেয়ার বা কুরসিতে নামায আদায় করে থাকেন তাদের সব সময় নামাযে কমি অনুভূত হবে। অর্থাৎ এরূপ সন্দেহ হবে যে, আমরা তো সিজদাই করলাম না আমাদের নামায হচ্ছে কি না?

হযরত হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ) একে অনুত্তম বলেন:

"সিজদা করার জন্য বালিশ ইত্যাদি কিছু উঁচু বস্তু রেখে দেয়া এবং এর উপর সিজদা করা উত্তম নয়। যখন সিজদা করতে অপারগ হবে তখন ইশারা করেই নামায আদায় করবে। বালিশ ইত্যাদি উঁচু কিছুর উপর সিজদা করার প্রয়োজন নেই। (বেহেশতী জেওর ২/৪৫, অসুস্থ ব্যক্তির নামাযের বর্ণনা)

উল্লেখিত দীর্ঘ আলোচনার সংক্ষিপ্ত নিম্নরূপ:

১। যে ব্যক্তি দাঁড়াতে সক্ষম নয়, কিন্তু যে কোন রূপে মাটিতে বসে রুকু-সিজদা করে নামায আদায় করতে পারে, তাকে মাটিতে বসেই রুকু সিজদা করে নামায আদায় করতে হবে। চেয়ার ইত্যাদিতে বসে ইশারায় রুকু সিজদা করে নামায আদায় করা জায়েয হবে না। নামায আদায় হবে না।

২। যদি দাঁড়াতে পারে, কিন্তু কোমর বা হাঁটুতে প্রচণ্ড ব্যথা হওয়ার কারণে সিজদা করার শক্তি নেই, অথবা ঐ ব্যক্তি যে মাটিতে বসতে পারে কিন্তু রুকু সিজদার শক্তি রাখে না, এরূপ লোক জমিতে বসে নামায আদায় করবে। চেয়ার ইত্যাদির ব্যবহার মাকরূহ হবে। হ্যাঁ যদি কোনভাবেই মাটিতে বসা দু:সাধ্য হয়ে পড়ে তখন চেয়ারে বসে নামায আদায় করা যেতে পারে। এমতাবস্থায় চেয়ার ব্যবহার করলেও সাদামাটা চেয়ার ব্যবহার করবে। টেবিলযুক্ত চেয়ার ব্যবহার করবে না। (রুকুর জন্য তিন নং রূপেরটি শুদ্ধ। (সর্বশেষ বাক্যটির সম্পর্ক প্রশ্নকারী কর্তৃক প্রেরিত ছবির সাথে)

মাটিতে বা চেয়ারে নামায আদায় করার ক্ষেত্রে দু'টি বিষয় প্রণিধানযোগ্য:

১। চেয়ারে ইশারা করে নামায পড়ার সময় অনেকে রুকুতে হাত রানের উপর রাখে এবং সিজদার সময় শূন্যে আলগে ধরে সিজদার ইশারা করে। এরূপ করা স্বীকৃত নয়। রুকু ও সিজদা উভয় ক্ষেত্রে হাত রানের উপর রাখা উচিৎ।

২। অক্ষম অবস্থায় মাটিতে বসে রুকু-সিজদার সাথে নামায আদায় করার ক্ষেত্রে রুকুতে নিতম্ব মাটি থেকে উঠানোর প্রয়োজন নেই। বরং কপাল হাঁটু বরাবর হওয়া জরুরী। যেমন এমদাদুল আহকামে আছে:

"বসা অবস্থায় রুকু করার সময় শুধু কপালকে হাঁটু বরাবর করা জরুরী। এর চাইতে বেশি ঝুঁকার প্রয়োজন নেই। না নিতম্ব উঠানোর প্রয়োজন আছে। (এমদাদুল আহকাম : ১/৬০৯)

চেয়ারে নামায আদায়কারীগণ এখন নিজের অবস্থার উপর চিন্তা করে দেখুন। বাস্তবে কি আপনি এমন অক্ষম যে, শরীয়তের দৃষ্টিতে আপনার জন্য চেয়ারে বসে নামায আদায় করা জায়েয হবে। বাস্তবে আপনি সেরূপ অক্ষম ও অপারগ না হলে চেয়ারে নামায আদায় পরিহার করতে হবে। যাতে আপনার নামায শরীয়ত অনুযায়ী হয়। মসজিদে প্রয়োজন ছাড়া চেয়ারের আধিক্য না হয়, মসজিদকে কোন কনভেশন সেন্টার, বা বিয়ে বাড়ী বা হল মনে না হয়। আর একান্ত প্রয়োজনে যদি চেয়ার ব্যবহার করতেই হয় তবে টেবিল যুক্ত চেয়ার যেন ব্যবহার না করা হয়।

উত্তরদাতা:
মুফতী যাইনুল ইসলাম কাসেমী

সত্যায়নকারী:
মুফতী হাবীবুর রহমান,
মুফতী মাহমুদুল হাসান
মুফতী ফখরুল ইসলাম

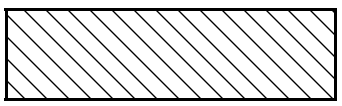

পবিত্র কুরআন মজীদের বিশুদ্ধ তেলাওয়াত রাসূল সা.কে প্রেরণের অন্যতম উদ্দেশ্য

মুফতী জাফর আলম আনোয়ার কাসেমী

কুরআনে কারীম পুরো মানবতার জন্য আল্লাহ তা'আলার এমন এক বড় নেয়ামত, পৃথিবীর কোন নেয়ামত, অর্থ-সম্পদ তথা কোন বস্তুই তার সমকক্ষ হতে পারে না। কুরআনের তেলাওয়াত, যিয়ারত, শোনা ও শোনানো, শিখা ও শিখানো, তার উপর আমল করা, তা প্রচার ও প্রসার করা, মোটকথা যে কোন আঙ্গিকে তার খেদমত করা, দুনিয়া ও আখিরাতে মহাকল্যাণ ও সৌভাগ্যের ব্যাপার।

সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত উক্ববা ইবনে আমের রা. হতে বর্ণিত, আমরা একদা সুফফায় বসেছিলাম। রাসূল -সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- তাশরীফ আনলেন এবং এরশাদ করলেন, "তোমাদের কেউ কি পছন্দ করবে যে, প্রতিদিন সকালে 'বুতহান' অথবা 'আকীক' নামক বাজারে যাবে এবং প্রতিদিন কোন গুনাহ অথবা আত্মীয়তা বিচ্ছেদ করা ছাড়াই উন্নতমানের উটনী নিয়ে আসবে? আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এটাতো আমাদের প্রত্যেকেই পছন্দ করবে। তখন রাসূল -সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- বললেন, যদি প্রতিদিন কোন ব্যক্তি মসজিদে গিয়ে যে কোন দু'টি আয়াত শিখে নেয় অথবা পড়ে নেয় তাহলে এটা তার জন্য দু'টি উটনী পাওয়ার চেয়েও উত্তম। তিনটি আয়াত শিখলে তিনটি উটনীর চেয়ে আর চারটি আয়াত শিখলে চারটি উটনী পাওয়ার চেয়ে উত্তম। (সহীহ মুসলিম-পৃ.৫৫২ হাদীস নং ৮০৩)

রাসূলে আকরাম -সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- কুরআনে করীমের তেলাওয়াত, তার ব্যাখ্যার এলেম অর্জন করা এবং তার প্রচার ও তাবলীগ এর যে ফজীলত হাদীস শরীফে বর্ণনা করেছেন এবং উম্মতকে এ ব্যাপারে যে পরিমাণ উৎসাহ ও তারগীব প্রদান করেছেন, উক্ত হাদীস তার মাত্র একটি দৃষ্টান্ত। হাদীস গ্রন্থাবলীতে এ জাতীয় অসংখ্য হাদীস উল্লেখ রয়েছে। এ জন্যই উম্মতে মুহাম্মদিয়ার মনীষীগণ কুরআনে কারীমের বিভিন্ন এমন এমন দিকসমূহের খেদমত করেছেন, তার শব্দ এবং অর্থ সংরক্ষণে এমন এমন কুরবানী স্বীকার করেছেন যা দেখে আর শুনে আজকের মানুষ হতবাক না হয়ে পারে না।

তাঁরা কুরআনে কারীমের অর্থ ও তাফসীরের জন্য যেমন বড় বড় গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেছেন তেমনই কিতাবে এলাহীর শব্দ, হরকত, সুকূন ও অক্ষরগুলিকে ঠিক ঠিকভাবে আদায় করার জন্যও বড় বড় গ্রন্থাবলী রচনা করেছেন; যা ইসলাম ব্যতীত পৃথিবীর সমস্ত ধর্মে বিরল।

কুরআনে কারীমের শব্দ, অক্ষর, হরকত, সুকূনকে জিহ্বার দ্বারা বিশুদ্ধভাবে আদায় করার জন্য যেই ইলম বা শাস্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে তাকে ইলমে কেরাত ও ইলমে তাজবীদ বলা হয়। ইলমে কেরাতের মূল লক্ষ্য হচ্ছে কুরআনের তেলাওয়াতকে বিশুদ্ধ করা। তেলাওয়াতকে বিশুদ্ধ করা, এটা কোন সাধারণ বিষয় নয়। বরং এটা আল্লাহ তাআলার নিকট রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই ধরায় প্রেরণের বড় বড় চারটি উদ্দেশ্যের অন্যতম। আল্লাহ তাআলা সূরা আলে ইমরানে এরশাদ করেন:

لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ـ

"আল্লাহ ঈমানদারদের উপর অনুগ্রহ করেছেন যে, তাদের মাঝে তাদের নিজেদের মধ্য থেকে নবী পাঠিয়েছেন। তিনি তাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ তেলাওয়াত (পাঠ) করেন। তাদেরকে পরিশোধন করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও কর্মের কথা শিক্ষা দেন।" (আলে-ইমরান আয়াত ১৬৪)

এই অর্থসম্বলিত আয়াত কুরআনে কারীমের মোট চার স্থানে উল্লেখ রয়েছে। দুবার সূরায়ে বাকারায়, একবার আলে ইমরানে, আরেকবার সূরা জুমু'আয়। চারটি আয়াতেরই ভাষ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা রাসূল -সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বড় বড় চারটি উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছেন।

১। তেলাওয়াতে কিতাব অর্থাৎ কুরআনের বিশুদ্ধ পাঠদান।

২। তাযকিয়ায়ে ক্বলব, অর্থাৎ মানুষের আত্মশুদ্ধি করণ।

৩। তা'লীমে কিতাব, অর্থাৎ কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা।

৪। তা'লীমে হিকমাত, অর্থাৎ শরীয়তের হুকুম আহকাম শিক্ষাদান করা।

রাসূল -সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণের উক্ত চারটি উদ্দেশ্যের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে, কুরআনের সহীহ ও বিশুদ্ধ তেলাওয়াত শিখানো। তেলাওয়াত বলতে কুরআনে করীমের শব্দ ও অক্ষরকে মাখরাজের সঠিক স্থান থেকে যথাযথভাবে আদায় করা। কুরআনের বিশুদ্ধ তেলাওয়াত যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণের গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো, তাহলে কুরআনের সহীহ ও বিশুদ্ধ তেলাওয়াত এই উম্মতের উপর গুরুত্বপূর্ণ করণীয় হিসেবে বিবেচিত হবে। কুরআনে করীমে এরশাদ হচ্ছে ورتل القرآن ترتيلا "এবং কুরআন পাঠ করুন সুবিন্যস্তভাবে ও সুস্পষ্টভাবে।" (আল মুযযাম্মিল, আয়াত-৪) এবং সূরা ফাতেরে এরশাদ হচ্ছে: ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقنا هم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور "যারা আল্লাহর কিতাব তেলাওয়াত করে, নামায কায়েম করে এবং আমি যা দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে তারা এমন ব্যবসা আশা করে যাতে কখনও লোকসান হবে না। (ফাতির, আয়াত ২৯)

সহীহুল বুখারীতে হযরত উসমান রা. সূত্রে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি যে কুরআন (এর তেলাওয়াত) শিখে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়। (সহীহুল বুখারী খণ্ড ৬, পৃ, ৪২৭, হাদীস নং ৫০২৭)

সহীহ তেলাওয়াতের এই অত্যধিক গুরুত্বের কারণেই অনেক সাহাবায়ে কেরাম কুরআনের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। যেমন: উবাই ইবনে কা'ব, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, মুআয ইবনে জাবাল, সালিম মাওলা হুযাইফা, যায়েদ ইবনে ছাবেত, আবু মূসা আশআরী, উসমান ইবনে আফফান, আলী ইবনে আবি তালিব এবং আবুদ্দারদা রাজিয়াল্লাহু আনহুমসহ আরো অনেক সাহাবায়ে কেরাম।

সহীহুল বুখারীতে উক্ত হাদীসের পরে উল্লেখ আছে যে, প্রসিদ্ধ তাবেয়ী হযরত আবু আব্দুর রহমান সুলামী রহ. বড়মাপের মুহাদ্দিস ছিলেন। তাঁর থেকে অনেক হাদীসও বর্ণিত আছে। কিন্তু তিনি সমগ্রজীবন বাচ্চাদেরকে কুরআন শিক্ষা দেয়ার কাজে ব্যয় করেছেন। বুখারী শরীফে উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত উসমান রা. এর খেলাফত কাল থেকে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের যুগ পর্যন্ত কূফার জামে মসজিদে পুরো জীবনটাকে তিনি শুধু কুরআন শিক্ষা দানে অতিবাহিত করে দিয়েছেন। তাঁর শিষ্য সা'আদ ইবনে উবায়দা জিজ্ঞেস করলেন, আপনি তো একজন বড়মাপের মুহাদ্দিস, আপনি দরসে হাদীসের (হাদীস শিক্ষাদান) পেশা গ্রহণ করতে পারেন। সুলামী রহ. উত্তরে বললেন وذاك الذى اقعد نى مقعدى هذا অর্থাৎ "হযরত উসমান রা. এর উক্ত হাদীসটি আমাকে এই স্থানে বসিয়ে রেখেছে।" (সহীহুল বুখারী খণ্ড-২, পৃ:-৭৫২ ভারতীয় এডিশন)

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, আজ যারা কুরআন শিক্ষা দেয়ার খেদমতে রত আছেন, তাদেরকে শিক্ষকদের স্তর বিন্যাসে অনেক ক্ষেত্রে নিম্ন মনে করা হয়। বেতন ভাতাতেও তাদের একই নীতি অনুসৃত হয়। অথচ আল্লাহর কুরআন মহান। যারা তা শিক্ষাদানের মাধ্যমে এর খেদমত করবেন, তারাও মহান হবেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

সূরা আলে ইমরানের আয়াতটির মধ্যে আরেকটি বিষয় লক্ষ্যণীয়। মুফতীয়ে আযম পাকিস্তান হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী রহ. বলেন, উক্ত আয়াতে তেলাওয়াত (পাঠদান)-কে ভিন্নভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তা'লীম (কুরআনের ব্যাখ্যাদান)-কে ভিন্নভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, কুরআনের অর্থ বুঝা যেমন জরুরী তেমনিভাবে কুরআনের শুধু তেলাওয়াতও শরীয়তে জরুরী বিষয়। অতএব যদি কেউ কুরআনে কারীম না বুঝে তেলাওয়াত করে সে ছাওয়াব পাবে। সেও মহানবী -সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- কে দুনিয়াতে প্রেরণের একটি উদ্দেশ্যের উপর আমল করল। সুতরাং আয়াতে করীমা দ্বারা এ কথা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, ঐ সকল লোকদের মতবাদ ভ্রান্ত যারা মনে করে, কুরআনে করীম বুঝেই পড়তে হবে। তোতা আর ময়নার মত বোটলে বা পড়লে কোন লাভ ও ছাওয়াব নেই। তেলাওয়াতের কথা যেহেতু পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, অতএব তেলাওয়াতকারী উভয় অবস্থাতেই ছাওয়াবের অধিকারী হবে। বুঝে পড়ুক বা না বুঝে পড়ুক।

আল্লাহ পাকের পবিত্র কালামের প্রত্যেকটি আয়াতে এবং প্রত্যেকটি অক্ষরে রূহানিয়্যাত, নূরানিয়্যাত, বিশেষ প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া বিদ্যমান। যা তেলাওয়াত করলেই হাসিল হয়। শুধুমাত্র বুঝে পড়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বর্ণিত আছে যে, সিরিয়া বিজয়ের পর হযরত উমর রা. যখন

সিরিয়ায় গমন করলেন আর রোম সম্রাট হিরাক্বল স্বয়ং এসে হযরত উমর রা. এর হাতে বায়তুল মোকাদ্দাসের চাবিখানা তুলে দিল, তখন হিরাক্বল তার একটি সমস্যার কথা ব্যক্ত করল। সমস্যাটি হল তার মাথায় সর্বদা প্রচণ্ড ব্যথা লেগেই থাকে। এতে সে সবসময় খুবই পেরেশানিতে থাকতো। তখন হযরত উমর রা. তাকে এর প্রতিষেধক হিসেবে ব্যবহারের জন্য একটি টুপি উপহার দিলেন। এই টুপি নেয়ার পর দেখা গেল, যতক্ষণ তা পরিহিত অবস্থায় থাকে ততক্ষণ মাথায় কোন ব্যথা থাকে না। কিন্তু টুপিটি খুলে রাখার পর পরই ব্যথা আরম্ভ হয়ে যায়। এ কারণে টুপিটি সম্পর্কে রিসার্চ করে দেখার আগ্রহ জন্মে তার মাঝে। একদিন সে টুপিটি খুলে চতুর্পাশে খুব ভালভাবে দেখল। দেখা গেল এতে একটি ছোট কাগজে بسم الله الرحمن الرحيم (বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম) লিখা আছে। বিসমিল্লাহর প্রভাবে তার মাথা ব্যথার উপশম হয়। (তারাশে, মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী পৃ: ৫২)

যদি বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীমেরই এতটা প্রভাব আর প্রতিক্রিয়া ও নূরানিয়্যাত থাকে তাহলে অন্যান্য আয়াতসমূহের মধ্যে কিরূপ আছর ও নূরানিয়্যাত বিদ্যমান থাকবে? এ থেকে একথাও স্পষ্ট যে, কুরআনের আয়াতের আছর আর নূরানিয়্যাতের সম্পর্ক কুরআন পাক শুধু বুঝে পড়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বুঝে পড়া হোক আর না বুঝে পড়া হোক, সর্বাবস্থায় কুরআনে পাকের আছর ও নূরান্যিাত হাসিল হবে।

সুনানে তিরমিযী ও মুসনাদে দারামীতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম -সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব থেকে একটি হরফ পাঠ করে সে একটি নেকী লাভ করে এবং (এই উম্মতের) একটি নেকীকে দশগুণ বৃদ্ধি করে দেয়া হয়। আমি বলছি না যে, الـــم (আলিফ, লাম, মিম) একটি হরফ। বরং الف একটি হরফ, لام একটি হরফ এবং ميـــم একটি হরফ। (তিরমিযী, হাদীছ নং ২৯১০, মুসনাদে দারামী খণ্ড-২ পৃ:-৮৮৭, হাদীছ নং ৩১৯০)

রাসূল -সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর উক্ত হাদীস দ্বারা এই কথা প্রতীয়মান হয় যে, الم উচ্চারণ করলে ত্রিশটি নেকী পাওয়া যায়। বরং আর একটু গবেষণা করলে বুঝা যায়, الف উচ্চারণ করতে তিনটি হরফ উচ্চারিত হয়। আলিফ, লাম, ফা। অতএব الف এর মধ্যে ত্রিশটি নেকী হল। তেমনিভাবে لام ও ميـــم এর মধ্যেও তিনটি করে হরফ রয়েছে। তাতে ত্রিশটি করে ষাটটি নেকী আছে। এই গবেষণা থেকে সহজে এ কথা সাব্যস্ত হয় যে,الـــم এক সাথে উচ্চারণ করলে নব্বইটি নেকী লাভ করা যায়।

সকল মুফাসসিরীনে কেরামের নিকট এ কথা নিরেট সত্য যে, الـــم এর নিশ্চিত ও সঠিক অর্থ একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত পৃথিবীর আর কেউই অবগত নয়। তাহলে الم এমন একটি আয়াত যার অর্থ কারও জানা নেই। কিন্তু তেলাওয়াতকারী তা উচ্চারণ করলে সাথে সাথে নব্বইটি নেকী পেয়ে যায়। এতে দৃঢ়ভাবে এ কথাই প্রমাণিত হয়, তেলাওয়াতের ছাওয়াব পাওয়ার জন্য কুরআন বুঝে পড়া শর্ত নয়। الم তো একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা হল। এছাড়া আরও এগারটি হরফ এমন আছে যেগুলোর অর্থ পৃথিবীর কেউ জানেন না। একমাত্র আল্লাহই জানেন। তথাপি তেলাওয়াতকারী আল্লাহর নিকট ছাওয়াবের অধিকারী হয়ে যায়। যেমন: حم عسق، كهيعص، الـــمر ইত্যাদি। এই কারণে হযরত মুহিউসসুন্নাহ শাহ আবরারুল হক্ব হারদূঈ রহ. বলতেন, 'কুরআনের প্রতিটি হরফে দশটি করে নেকী পাওয়া যায়। না বঝে পড়লেও এই নেকী পাওয়া যায়। যদি কেউ বলে না বুঝে পড়লে কোন লাভ নেই, তাহলে সেই ব্যক্তি বদদীন বা জাহেল, অথবা উভয়টি'।

কুরআন শরীফের বিশুদ্ধ তেলাওয়াত শিখার একটাই পদ্ধতি রয়েছে। তাহল কোন দক্ষ ও অভিজ্ঞ ক্বারী অথবা বিশুদ্ধ তেলাওয়াতকারী আলেমের কাছে গিয়ে সরাসরি তার মুখ থেকে প্রতিটি হরফের সহীহ উচ্চারণসহ বিশুদ্ধ তেলাওয়াত শিক্ষা করা। রাসূলে কারীম -সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- থেকে এই পদ্ধতিই চলে আসছে। হযরত জিবরাঈল আ. সরাসরি রাসূল -সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে শুনাতেন। রাসূল -সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- তা শুনে পুনরায় পড়তেন। এরপর রাসূল -সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- সাহাবায়ে কেরাম রা.কে শুনাতেন। সাহাবায়ে কেরাম তা শুনে অনুরূপভাবে তা পড়ার চেষ্টা করতেন। আমাদের পর্যন্ত ধারাবাহিকতা এভাবেই চলে এসেছে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে তাওফীক দান করুন। আমীন।

ভালবাসা : একটি পর্যালোচনা

মাওলানা কাজী ফজলুল করিম

(এক) ভালবাসা কাকে বলে?

ভালবাসা মানুষের এক স্বভাবজাত প্রকৃতি। ভালবাসাহীন মানুষ পশুর চেয়েও অধম। বনের পশুদের মাঝেও আছে ভালবাসা। ভালবাসা মহান আল্লাহর এক বিশেষ দান। আল্লাহ নিজেই তার বান্দাদেরকে ভালবাসেন। মহান আল্লাহ ঘোষনা করেনঃ "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাকারী ও পবিত্রতা অবলম্বনকারীদেরকে ভালবাসেন।"(সূরাঃ২ বাক্বারাহ, আয়াতঃ ২২২)

আরবী ভাষায় ভালবাসার প্রতিশব্দ হল 'মুহাব্বাত' বা 'মাহাব্বাত'। আল-কুরআনে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে হযরত মুসা আঃ কে কেন্দ্র করে। মহান আল্লাহ বলেনঃ "তুমি (মুসা আঃ এর জননী) তাকে (মুসা আঃ কে) সিন্দুকে রাখ, অতঃপর তা দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও, অতঃপর দরিয়া তাকে তীরে ঠেলে দেবে। তাকে আমার শত্রু ও তার শত্রু উঠিয়ে নেবে। আমি তোমার প্রতি 'মাহাব্বাত' (ভালবাসা) সঞ্চারিত করেছিলাম আমার নিজের পক্ষ থেকে, যাতে তুমি আমার দৃষ্টির সামনে প্রতিপালিত হও।" (সূরাঃ২০ ত্বাহা, আয়াতঃ ৩৯)

'মুহাব্বাত' শব্দের অর্থ হল পরস্পর ভালবাসা। আর 'মাহাব্বাত' শব্দের অর্থ হল প্রিয় কোন জিনিসের প্রতি আন্তরিক আকর্ষণ। উভয় শব্দ 'হাব্বাতুন' শব্দ হতে নির্গত। যার অর্থ হল বীচি। বীচি যেমন নিজেকে বিদীর্ণ করে একেবারে নিঃশেষ করে বৃক্ষের জন্ম দিয়ে থাকে, অনুরূপ ভাবে মানুষের অন্তর বিদীর্ণ হয়ে ভালবাসার উন্মেষ ঘটে এবং এক পর্যায়ে সে নিজেকে ভালবাসার জন্য নিঃশেষ করে দিতে একটুও দ্বিধাবোধ করে না। 'আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন' নামক গ্রন্থে 'মুহাব্বাত' শব্দের পরিচিতি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, "যে জিনিস বা যে বিষয়কে আপনি কল্যাণকর হিসাবে দেখেন বা কল্যাণকর হিসাবে মনে করেন সেই জিনিস বা সেই বিষয়ের কামনাই হল 'মুহাব্বাত' বা ভালবাসা।

(দুই) ভালবাসার প্রকারভেদ

ভালবাসাকে আমরা পাঁচ ভাগে বিভক্ত করতে পারি।(এক)মুহাব্বাতে তবয়ী বা প্রকৃতিগত কারনে ভালবাসা। এর উদাহরণ হল মা-বাবা ও সন্তান-সন্ততির পারস্পরিক ভালবাসা এবং নিজের প্রতি নিজের ভালবাসা। এই প্রকারের ভালবাসার ভিত্তি 'নৈকট্যতা'।(দুই) মুহাব্বাতে এহসানী বা বদান্যতাসুলভ ভালবাসা। কেউ যদি কাউকে কোন বিষয়ে অনুগ্রহ করে, ভাল আচরণ করে তখন ঐ ব্যক্তির প্রতি তার ভালবাসা সৃষ্টি হয়। এরূপ ভালবাসার নাম হল মুহাব্বাতে এহসানী বা বদান্যতাসুলভ ভালবাসা। এর ভিত্তি হল 'অনুগ্রহ'।(তিন)মুহাব্বাতে জামালী বা সৌন্দর্যগত কারনে ভালবাসা। কারো রূপ-যৌবনে আকৃষ্ট হয়ে তার প্রতি যে ভালবাসার সৃষ্টি হয় সেই ভালবাসা হল মুহাব্বাতে জামালী বা সৌন্দর্যগত ভালবাসা। এর ভিত্তি হল 'সৌন্দর্য'। (চার)মুহাব্বাতে কামালী বা গুণগত কারনে ভালবাসা। কোন ব্যক্তির বিশেষ কোন গুণ থাকলেও মানুষ তাকে ভালবাসে চাই সে যতই অসুন্দর হোক না কেন। গুণী ব্যক্তির প্রতি মানুষের অন্তরে এক ধরনের ভালবাসা সৃষ্টি হয়। এরূপ ভালবাসার নাম হল মুহাব্বাতে কামালী বা গুণগত ভালবাসা। এর ভিত্তি হল 'বিশেষ কোন গুণ'।(পাঁচ) মুহাব্বাতে আক্বলী বা বুদ্ধিবৃত্তিক ভালবাসা। মানুষ তার নিজের স্বার্থে ভাল-মন্দ বোঝে এবং সব রকমের ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকতে সচেষ্ট হয়। সে কারনেই মানুষ নিজের সুস্থতার স্বার্থে ডাক্তারের শরনাপন্ন হয়ে অপারেশনের মাধ্যমে দেহের কোন অংগ কেটে ফেলে দিতেও দ্বিধাবোধ করে না এবং অঙ্গ হানি করার পরেও মানুষ ঐ ডাক্তারকে উপকারী ভাবে এবং ভালবাসে। এরূপ ভালবাসার নাম হল মুহাব্বাতে আক্বলী বা বুদ্ধিবৃত্তিক ভালবাসা। এর ভিত্তি হল 'বুদ্ধি'।

(তিন) ভালবাসবো কাকে?

পৃথিবীতে মানুষ উল্লেখিত কারন সমূহের কোন না কোন কারনে ভালবাসে মানুষকে। খুব গভীর ভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, ভালবাসার উল্লেখিত প্রকার বা

কারণসমূহ কোন এক ব্যক্তির মাঝে একই সঙ্গে একত্রিত হওয়া বিরল একটি ব্যাপার। এই বিরল ব্যাপারটি যে ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে ঘটেছিল এবং এখনও বিদ্যমান আছে, তিনি হলেন বিশ্বমানবতার মুক্তির দূত রহমাতুল্লিল আ'লামীন হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ভালবাসার সবগুলো কারণ একমাত্র তাঁরই মাঝে বিদ্যমান।

কেননা, হযরত যায়েদ রাযিঃ তার পিতা-মাতার প্রতি মুহাব্বাতে তবয়ী বা প্রকৃতিগত ভালবাসার বন্ধন ছিন্ন করে মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাঃ কে ভালবেসে দেখিয়েছেন যে প্রকৃতিগত ভালবাসার যে আকর্ষণ তার চাইতেও অধিক আকর্ষণ মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাঃ-এর মাঝে বিদ্যমান। হযরত যায়েদ রাযিঃ কে দূর্বত্তরা মক্কার বাজারে বিক্রি করে দেয়, এদিকে হযরত যায়েদের বাপ-চাচা যায়েদকে খুঁজতে খুঁজতে মক্কায় এসে উপস্থিত হয় এবং জানতে পারে যে যায়েদ এখন মুহাম্মাদের গৃহে। রাসূলুল্লাহ সাঃ হযরত যায়েদকে তার বাপ-চাচার সাথে চলে যাওয়ার অনুমতি দেয়া সত্ত্বেও হযরত যায়েদ রাসুলুল্লাহ সাঃ-এর মুহাব্বাতে তার বাপ-চাচার সাথে চলে যেতে রাজি হননি। এটি হল প্রকৃতিগত ভালবাসার বন্ধন ছিন্ন করে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাঃ কে ভালবাসার উদাহরণ।

ভালবাসার দ্বিতীয় কারণ অনুগ্রহ বা উত্তম আচরণ। এই প্রকারের ভালবাসার উদাহরণ মুহাম্মাদ সাঃ-এর বিরোধিতাকারী স্বয়ং মক্কার কাফেররা। কেননা মক্কার কাফেররা মুহাম্মাদ সাঃ-এর আচরণে সন্তুষ্ট হয়ে একবাক্যে তাকে আল-আমীন বলে স্বীকার করে নিয়েছিল।

ভালবাসার তৃতীয় কারণ হল সৌন্দর্য। সৌন্দর্যের কারণে যদি ভালবাসতে হয় তাহলে এক্ষেত্রেও রাসূলুল্লাহ সাঃ-এর চাইতে অধিক যোগ্য আর কে হতে পারে! কেননা, পৃথিবীর সকল সৌন্দর্যের তুলনায় রাসূলুল্লাহর সৌন্দর্য ছিল সর্বাধিক।

ভালবাসার চতুর্থ কারণ হল বিশেষ কোন গুণ। এক্ষেত্রে তিনি যে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ একজন গুণী ছিলেন এ ব্যাপারে অমুসলিম ঐতিহাসিকেরাও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন।

ভালবাসার পঞ্চম কারণ হল বুদ্ধি। এক্ষেত্রেও একজন বুদ্ধিমান মানুষ এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, মুহাম্মাদ সাঃ-ই তো অন্ধকারাচ্ছন্ন বর্বর একটি জাতিকে আদর্শ একটি জাতিতে পরিণত করেছিলেন। একটি আদর্শ সমাজ ও একটি আদর্শ রাষ্ট্রগঠনে সর্বকালের সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব তিনিই। তাই ভালবাসতে যদি হয়, তাহলে তাকেই ভালবাসতে হবে। তাঁকে পৃথিবীর সব কিছুর চাইতে অধিক না ভালবাসলে প্রকৃত মু'মিন হওয়া যাবে না। হযরত আনাস রাযিঃ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেনঃ "তোমাদের কেহই প্রকৃত মু'মিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার পিতা, তার সন্তান এবং সকল মানুষের চাইতে মুহাম্মাদ সাঃ-কে অধিক না ভালবাসবে।(বুখারী শরীফ, হাদীস নং-১৫)

(চার) ভালবাসার মানদণ্ড

কাউকে ভালবাসা এবং কারো সাথে শত্রুতা রাখার মানদন্ড হলো একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি। একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই কাউকে ভালবাসতে হবে এবং শত্রুতাও যদি কারো সাথে রাখতে হয়, তাও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই। রসূলুল্লাহ সাঃ ইরশাদ করেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট শ্রেষ্ঠ আমল হলো আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই কাউকে ভালবাসা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই কারো সাথে শত্রুতা রাখা"।(মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বল, হাদীস নং-২১৩৪১)

(পাঁচ) ভালবাসার ফযীলত

মহান আল্লাহর ইজ্জতের মহত্ত্বের নিমিত্তে যারা পরস্পর ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপন করে, কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ তাদেরকে তাঁর রহমতের ছায়ায় জায়গা দেবেন। রাসুলুল্লাহ সাঃ ইরশাদ করেন, "কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ বলবেন, আমার মহত্ত্বের নিমিত্তে পরস্পর ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপনকারীরা কোথায়? আজ আমি তাদেরকে আমার বিশেষ ছায়ায় ছায়া দান করব। আজ এমন দিন, যেদিন আমার ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া নেই"। (মুসলিম শরীফ, হাদীস নং-৬৭১৩)

(ছয়) ভালবাসা বৃদ্ধি করার উপায়

পরস্পরের মাঝে ভালবাসা ও সৌহার্দ স্থাপিত না হলে পরিপূর্ণ ঈমানদার হওয়া যায় না, শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করা যায় না, এমনকি জান্নাতও লাভ করা যাবে না। তাই রাসূলুল্লাহ সাঃ মু'মিনদের মাঝে ভালবাসা ও সৌহার্দ বৃদ্ধির জন্য একটি সুন্দর পন্থা বাতলে দিয়েছেন। তিনি বলেন, "তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার না হবে, তোমরা ঈমানদার হতে পারবে না

যতক্ষণ পর্যন্ত না পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা ও সৌহার্দ স্থাপন করবে। আমি কি তোমাদেরকে এমন বিষয়ের কথা বলবো না, যা করলে তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও সৌহার্দ প্রতিষ্ঠিত হবে? সাহাবীগণ বললেন, নিশ্চয়ই ইয়া রাসূলুল্লাহ!(তিনি বললেন) তোমাদের মধ্যে বহুল পরিমাণে সালামের প্রচলন কর" ।(মুসলিম শরীফ, হাদীস নং-২০৩)

(সাত) মহান আল্লাহ যাদেরকে ভালবাসেন

মহান আল্লাহ ভালবাসেন অনুগ্রহকারী বান্দাদেরকে (সূরাঃ২ বাক্বারাহ, আয়াতঃ ১৯৫। সূরাঃ৩ আলে-ইমরান, আয়াতঃ ১৩৪,১৪৮। সূরাঃ ৫ আল-মায়িদাহ, আয়াতঃ ১৩,৯৩) সর্বমোট পাঁচ জায়গায় মহান আল্লাহ অনুগ্রহকারী বান্দাদেরকে ভালবাসেন বলে আল-কুরআনে উল্লেখ করেছেন। অনুরূপ ভাবে তিনি তওবাকারী ও পবিত্রতা অবলম্বনকারী বান্দাদেরকে ভালবাসেন (সূরাঃ২ বাক্বারাহ, আয়াতঃ ২২২। সূরাঃ৯ তওবা, আয়াতঃ ১০৮) তিনি ভালবাসেন তাক্বওয়া অবলম্বনকারী বান্দাদেরকে (সূরাঃ৩ আলে-ইমরান, আয়াতঃ ৭৬। সূরাঃ৯ তওবা, আয়াতঃ ৪,৭) সর্বমোট তিন জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে তাক্বওয়া অবলম্বনকারীদেরকে ভালবাসার কথা। তিনি ভালবাসেন ধৈর্য ধারণকারীদেরকে (সূরাঃ৩ আলে-ইমরান, আয়াতঃ ১৪৬) তিনি ভালবাসেন আল্লাহর প্রতি ভরসাকারী বান্দাদেরকে (সূরাঃ৩ আলে-ইমরান, আয়াতঃ ১৫৯) তিনি ভালবাসেন সুবিচারকারী বান্দাদেরকে (সূরাঃ৫ আল-মায়িদাহ, আয়াতঃ ৪২) তিনি ভালবাসেন আল্লাহর পথে যুদ্ধকারী বান্দাদেরকে (সূরাঃ৬১ আসসফ, আয়াতঃ৪)

আল-কুরআনে আট ধরনের মানুষকে সরাসরি মহান আল্লাহ ভালবাসেন বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। যথাক্রমে আট ধরনের মানুষগুলো হলঃ (এক) অনুগ্রহকারী। (দুই) তওবাকারী। (তিন) তাক্বওয়া অবলম্বনকারী। (চার) ধৈর্যধারনকারী। (পাঁচ) আল্লাহর প্রতি ভরসাকারী। (ছয়) সুবিচারকারী। (সাত) পবিত্রতা অবলম্বনকারী। (আট) আল্লাহর পথে যুদ্ধকারী।

(আট) মহান আল্লাহ যাদেরকে ভালবাসেন না

মহান আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে ভালবাসেন না (সূরাঃ২ বাক্বারাহ, আয়াতঃ ১৯০) তিনি ভালবাসেন না বিশৃংখলাকে (সূরাঃ২ বাক্বারাহ, আয়াতঃ ২০৫) তিনি ভালবাসেন না অবিশ্বাসী (কাফের) পাপীদেরকে (সূরাঃ২ বাক্বারাহ, আয়াতঃ২৭৬) তিনি ভালবাসেন না কাফেরদেরকে (সূরাঃ৩ আলে ইমরান, আয়াতঃ ৩২। সূরাঃ৩০ রূম, আয়াতঃ ৪৫) তিনি ভালবাসেন না অত্যাচারীদেরকে (সূরাঃ৩ আলে ইমরান, আয়াতঃ ৫৭,১০৪। সুরাঃ৪২ আশশূরা, আয়াতঃ ৪০) তিনি ভালবাসেন না দাম্ভিক-গর্বিতজনদেরকে (সূরাঃ৪ নিসা, আয়াতঃ৩৬। সূরাঃ১৬ আন-নহল, আয়াতঃ ২৩। সূরাঃ২৮ আল-ক্বাসাস, আয়াতঃ ৭৬। সূরাঃ৩১ লুক্বমান, আয়াতঃ ১৮। সূরাঃ৫৭ আল-হাদীদ, আয়াতঃ ২৩) তিনি ভালবাসেন না বিশ্বাসঘাতক পাপীদেরকে (সূরাঃ৪ নিসা, আয়াতঃ১০৭। সূরাঃ২২ হজ্ব, আয়াতঃ ৩৮) তিনি ভালবাসেন না কোন মন্দ বিষয় প্রকাশ করাকে। তবে, কারো প্রতি জুলুম হয়ে থাকলে সে কথা আলাদা (সূরাঃ৪ নিসা, আয়াতঃ১৪৮) তিনি ভালবাসেন না বিশৃংখলাকারীদেরকে (সূরাঃ৫ আল-মায়িদাহ, আয়াতঃ৬৪। সূরাঃ২৮ আল-ক্বাসাস, আয়াতঃ৭৭) তিনি ভালবাসেন না সীমা অতিক্রমকারীদেরকে (সূরাঃ৫ আল-মায়িদাহ, আয়াতঃ৪৭। সূরাঃ৭ আ'রাফ, আয়াতঃ ৫৫) তিনি ভালবাসেন না অপব্যয়কারীদেরকে (সূরাঃ৬ আল-আ'নআম, আয়াতঃ ১৪১। সূরাঃ৭ আ'রাফ, আয়াতঃ ৩১) তিনি ভালবাসেন না প্রতারকদেরকে (সূরাঃ৪ আনফাল, আয়াতঃ ৫৮) আল-কুরআনে বারোটি বিষয় সরাসরি মহান আল্লাহ ভালবাসেন না বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। যথাক্রমে বারোটি বিষয় হলঃ (এক) সীমালঙ্ঘনকারী। (দুই) বিশৃংখলা। (তিন) অবিশ্বাসী (কাফের) পাপী। (চার) কাফের। (পাঁচ) অত্যাচারী। (ছয়) দাম্ভিক-গর্বিত। (সাত)বিশ্বাসঘাতক পাপী। (আট) মন্দ বিষয় প্রকাশক। (নয়)বিশৃংখলাকারী।(দশ)সীমা অতিক্রমক। (এগার)অপব্যয়কারী। (বারো)প্রতারক।

লেখক, মুহাদ্দিস-জামিয়া আরাবিয়া শামসুল উলূম। নিশিন্দারা (কারবালা মাদরাসা) বগুড়া।
e-mail: kf.karim@yahoo.com.

হাকীমুল উম্মত, মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.-এর রচনা সম্ভার ও তার বাহ্যিক উপকরণসমূহ

মূল : মাওলানা আব্দুল লতীফ কাসেমী

অনুবাদ : সলিম মাহ্‌দি

পৃথিবীতে অসংখ্য কলামিস্ট ও অগণিত লেখক পণ্ডিত এবং সংকলক এসেছেন। যারা অগণিত বই-পুস্তক রচনা করেছেন এবং সমৃদ্ধ করেছেন নিজেদের সৃজনী সম্ভার। কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালা তাদের সেই বই-পুস্তক ও রচনা সম্ভারকে স্থায়িত্ব দেন নি। কারণ, আল্লাহ তা'য়ালা তাদের সেই সকল বই-পুস্তক ও রচনা সম্ভারকে কবুল করেননি। তাই ঐ বইগুলোর নাম-নিশানা পর্যন্ত পৃথিবীতে আজ আর অবশিষ্ট নেই। আল্লামা খোরশী মালেকী রহ. ''মুখতাসারুল খালীল'' গ্রন্থের ভূমিকায় একটি ঐতিহাসিক বাক্য লিখেছেন, كم من تاليف طوى ذكره ولم يشتغل به "এমন অসংখ্য রচনা ও গ্রন্থ পৃথিবীতে প্রকাশিত হয়েছিল, এখন যার আর কোন নাম-নিশানা বা ভগ্নাংশও অবশিষ্ট নেই। এবং সেগুলোর মাধ্যমে মানুষের কোন উপকারও অর্জিত হয়নি।" এর বিপরীত কিছু লেখক ও সংকলক এমন আছেন, যাদের কিতাবাদি ও বই-পুস্তক আল্লাহ তা'আলা কবুল করেছেন। তা মানুষের কাছে স্মরণীয়-বরণীয় হয়ে আছে। এবং তাদের রচনা দ্বারা সর্ব সাধারণ উপকৃত হচ্ছে। ইমাম মালেক রহ.-এর যুগে 'ইবনে আবি যীব' নামের এক বুযুর্গ ছিলেন। তিনি 'মুয়াত্তা' নামের একটি কিতাব রচনা করেন। যা আকারে ইমাম মালেক রহ.-এর 'মুয়াত্তার' চেয়েও বড়। তখন মানুষ ইমাম মালেক রহ.-কে জিজ্ঞাসা করল, ماالفائدة فى تصنيفه؟ এখন আপনার 'মুয়াত্তা'র প্রয়োজন কি? তখন ইমাম মালেক রহ. বলেছিলেন, ما كان لله بقى যা আল্লাহর জন্য হয়, তা চিরস্থায়ী হয়। আল্লাহ তা'য়ালা তার রচনাকে কবুল করলেন। এ জন্য তাঁর রচনা দ্বারা কুরআন-হাদিসের 'নস' (মূল পাঠ) এবং শরিয়তের উৎস বুঝতে সাহায্য নেয়া হয়। তার বাণী সনদের মর্যাদা লাভ করল। তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে গেছেন। কিন্তু আপন রচনার মাধ্যমে সকলের মাঝে অমর হয়ে আছেন। তাঁর কিতাবাদী দ্বারা জাতি যথার্থ উপকৃত হচ্ছে। তাঁর কিতাব আমাদের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত এবং আমাদের লাইব্রেরীর সৌন্দর্য। লিখক ও গবেষক, সংকলক ও ব্যাখ্যাকারক এবং মুফতি-মুহাদ্দিস ও ছাত্র-শিক্ষক সকলের তথ্যসূত্র এবং নয়নের কাজল হয়ে আছে।

আকাবির তথা পূর্বসূরীগণ এবং অসংখ্য গবেষক বিভিন্ন বিষয়ে গ্রহণযোগ্য কিতাবাদী ও রচনা সম্ভার জাতিকে উপহার দিয়ে গেছেন। যেমন, ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান আশ্-শায়বানী রহ., ইমাম ত্বহাবী রহ., ইমাম সোলাইমান ইবনে আহমদ তাবরানী রহ. (৪৬ টি গ্রন্থ) আলী ইবনে আমর দারে কুতুনী রহ. (৮০), আবু আব্দুল্লাহ হাকেম নিসাপুরী রহ. (১৫০০ পুস্তিকা) আহমদ ইবনে হাসান, আবু রকর বায়হাকী শাফেয়ী রহ. (১০০০), আহমদ ইবনে আলী ইবনে সাবেত-যিনি খতীবে বাগদাদী নামে প্রসিদ্ধ (৫৬), মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আল-গাজ্জালী রহ. আবুল ফরজ ইবনুল জওযী রহ. (২০০০), আবুল বরকাত আন্-নাসাফী, মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে উসমান শামশুদ্দীন আয্-যাহাবী, তাকী উদ্দীন আস্-সুবকী রহ. (১৫০), ইহয়া ইবনে শরফ আন্-নাববী আশ্-শাফেয়ী, হাফেজ ইবনে তাইমিয়া, হাফেজ ইবনে হাজার আস্-কালানী, হাফেজ বদরুদ্দীন আয়নী, আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমান আস্-সাখাবী (২০০), জালালুদ্দীন সুয়ুতী রহ. (৭২৫), আল্লামা মুহাম্মদ আব্দুর রউফ ইবনে তাজুল মানাবী রহ. (৮০), ইবনে রজব হাম্বলী, আল্লামা মাহমুদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-আলুসী রহ. প্রমূখ। আল্লাহ তা'য়ালা এই সকল পূর্বপুরুষগণকে গোটা উম্মতের পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান দান করুন, আমীন।

আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য মুবারক বুযুর্গদের মধ্যে অন্যতম হলেন, হযরত শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ., মুফাক্কিরে ইসলাম হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী রহ.। বিশেষত হাকীমুল উম্মত, মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.। তাঁরই আলোচনা এখানে মুখ্য উদ্দেশ্য।

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. তাঁর লিখনীর সূচনা থেকেই মানসম্পন্ন ও গ্রহণযোগ্য কিতাবাদী ও বই পুস্তক জাতিকে

উপহার দিয়ে এসেছেন। তাসাউফ, তাফসীর, হাদিস, ফিকহ, ইলমুল কালাম, এবং তাজবীদ ইত্যাদি শাস্ত্রে তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থ ও রচনা রয়েছে। হযরতজী যে বিষয়ে কলম ধরেছেন তা নিয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করেছেন। তাঁর লিখিত বিষয়ের কোন একটি দিকও অসম্পূর্ণ দৃষ্টিগোচর হয় না। এবং প্রতিটি বিষয় 'দলীলে আকলী' (যৌক্তিক দলীল) ও 'দলীলে নকলী' (বর্ণনাভিত্তিক দলীল) দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ তা'য়ালা হযরতকে কিতাবাদির আধিক্যতা ও রচনা সম্ভারের সাথে সাথে সর্ব সাধারণের নিকট তাঁর রচনাগুলোর গ্রহণযোগ্যতা এবং ব্যাপক উপকারিতার সৌভাগ্য দান করেছেন। হযরতজীর কিতাবাদী সাধারণ জনতা ও আলেম সমাজ সকলের কাছে সমাদৃত এবং সকল উম্মত তা থেকে সমানভাবে উপকৃত হচ্ছে।

শুরু থেকেই খোদা প্রদত্ত বরকত, আল্লাহর বিশেষ সাহায্য এবং গায়েবী মদদ সদা হযরতজীর লেখনীর সাথে লেগে ছিল। তাই, তিনি আঠার বছর বয়সে [ছাত্রজীবনেই] ফার্সী ভাষায় মাস্‌নবী ''যের ওয়া বম' লিখেছেন। হযরতজী যখন আপন মুরশিদ 'হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ' সাহেব মুহাজিরে মক্কী রহ.-এর খিদমতে ছিলেন তখন হাজী সাহেব রহ.-এর নির্দেশে 'হযরত ইবনে আতা ইসকন্দরী' রহ.-এর কিতাব 'তানবীরের' উর্দূ ভাষায় 'একসীর ফি ইসবাতিত্ তাক্বদীর' তরজমা করছিলেন। তখন হাজী সাহেব রহ. অল্প সময়ে বেশী কাজ হতে দেখে এই সু-সংবাদ শুনান যে, ''আল্লাহ তা'য়ালা তোমার সময়ে বরকত দান করেছেন''। তাই হযরতজীর সময়ের বরকত স্পষ্ট নজরে পড়ে। অতি অল্প সময়ে হযরতজী যত কাজ করতেন, তা অন্যদের পক্ষে দীর্ঘসময় ব্যয় করেও সম্ভব হতো না। এই বাস্তবতার স্বীকৃতি অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাই দিয়েছেন যে, ''তিনি গায়েবী সাহায্য দ্বারা ধন্য ছিলেন''।

রচনা সম্ভারে গায়েবী সাহায্যের কয়েকটি বাহ্যিক কারণ :

হযরতজীর রচনার আধিক্যতার বাহ্যিক কারণসমূহ, যা তাঁর বিশিষ্ট খলিফা এবং হযরতজীর জীবনী লিখক হযরত খাজা আযীযুল হাসান মজযুব রহ. 'আশ্‌রাফুস্ সাওয়ানেহ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, তা মোট ছয়টি।

প্রথম কারণ : উৎসাহ ও উদ্দীপনা

হযরতজী কোন কাজ আরম্ভ করলে তা সমাপ্ত করার জন্য এত বেশী ব্যস্ত হয়ে যেতেন যে, কাজটি সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত অস্থির ও ব্যকূল হয়ে পড়তেন। একান্ত প্রয়োজনীয় কাজ ব্যতীত দিবা-রাত্রি, সময়-অসময় সদা তা সমাপ্ত করার কাজে নিয়োজিত থাকতেন। অত্যন্ত তড়িগড়ি করে কাজটি সমাপ্ত করেই ক্ষান্ত হতেন।

খাজা আযীযুল হাসান মজযুব রহ. লিখেন, অধমের খুব ভালভাবে স্মরণ আছে, যখন 'কলিদে মুসনবীর' ব্যাখ্যা প্রায় শেষের দিকে তখন তা সমাপ্ত করার ইচ্ছা হযরতজীর নিকট এত প্রবল হয়ে উঠল যে, পুরো দিন লিখলেন, অতঃপর পুরো রাত লিখলেন, এক মিনিটের জন্যও বিশ্রাম নেননি। ফজরের পূর্বে তা সমাপ্ত করে স্বস্থির নিঃশ্বাস ফেলেন। এবং বলেন, গোটা রাত জাগ্রত থাকার সুযোগ ইতিপূর্বে হয়নি। অভ্যাসের বিপরীত অস্বাভাবিক ক্লান্তির কারণে জ্বরে আক্রান্ত হলেন। কিন্তু প্রচণ্ড জ্বরের মধ্যেও এক প্রকার স্বস্থি অনুভব করতে দেখলাম। যেহেতু কাজ সমাপ্ত করার পর জ্বর হয়েছে।

দ্বিতীয় কারণ : উপস্থিত জ্ঞান

গায়েবী সাহয্যের দ্বিতীয় কারণ হল, কোন বিষয়ে লিখতে বসলে হজরতজীকে অতিরিক্ত চিন্তা-ফিকির করতে হতো না। সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম বিষয়গুলো তিনি অতি সহজে লিখে দিতেন। যদিও লিখা অবস্থায় বা পরে তাতে সংযোজন-বিয়োজন করতেন।

তৃতীয় কারণ : অনর্থক কাজ থেকে মুক্ত থাকা

তৃতীয় কারণ হল, সময় বরকতময় হওয়া। প্রতিবন্ধকতা মুক্ত সময় পাওয়া। হযরতজী বলেন, তাফসীরে বয়ানুল কুরআন লেখার সময় [প্রায় আড়াই বছর পর্যন্ত] আমার কান গরম হয়নি। অথচ তখন প্লেগ বা মহামারীর প্রাদুর্ভাব খুব বেশী হয়েছিল। হযরতজী বলতেন, তাফসীর লিখা অবস্থায় আমাদের শহরে মহামারীর খুব বেশী ছড়াছড়ি। তাই আমি আল্লাহর দরবারে দু'আ করলাম, হে আল্লাহ! তাফসীর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত আমাকে জীবিত রাখুন। আল্লাহ তা'য়ালা আপন দয়ায় আমার কানও গরম করেননি। আল্-হামদুলিল্লাহ, কোন ধরণের অসুবিধা ছাড়া, সুস্থ ও স্বজ্ঞানে তাফসীর লেখার কাজ সমাপ্ত হল।

চতুর্থ কারণ : কৃত্রিমতা ও কপটতা থেকে বেঁচে থাকা

হযরতজীর রচনার আধিক্যের চতুর্থ কারণ হল অতিরঞ্জন না করা। হযরত মাওলানা হাবীবুর রহমান সাহেব [সাবেক মুহতামিম, দারুল উলুম দেওবন্দ] এর মতও তাই ছিল। হযরত থানভী রহ. মাওলানা হাবীবুর রহমান সাহেবের এই মতটি উল্লেখ করে বলেছেন, তিনি বিলকুল সত্য বলেছেন। অতিরিক্ত বিতর্ক ও বাড়াবাড়ি দ্বারা কাজ হয় না। আমার দৃষ্টি কেবল প্রয়োজনের প্রতি নিবদ্ধ। প্রয়োজনাতিরিক্ত বিতর্ক করার কারণে অন্তর কঠোর হয়ে যায়। তাই আমার 'ইবারত' (মূল রচনা) অনেক ছোট

হয়ে থাকে। কিন্তু দাবী প্রকাশ করার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অর্থবোধক ও যথেষ্ট মর্ম বাহক এবং স্পষ্ট হয়ে থাকে। প্রয়োজন ছাড়া কখনো দীর্ঘ করি না। তবে যেখানে স্পষ্ট করার জন্য দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন সেখানে দীর্ঘ আলোচনা ছেড়ে যায় না। হযরতজী যখন অত্যধিক কিতাবাদী লিখতেন তখন সর্বদা হাতের কাছে পেন্সিল ও কাগজ রাখতেন। যখনই ঐ বিষয়ে কোন মর্ম অন্তরে আসতো তৎক্ষণাত লিখে নিতেন। অনেক সময় রাত্রি বেলা শুয়ার সময় বালিশের নীচে কাগজ এবং পেন্সিল রাখতেন। যেন রাত্রিবেলা কোন মর্ম উপস্থিত হলে তা তৎক্ষণাত স্মৃতি থেকে লিখে নিতে পারেন।

পঞ্চম কারণ : সময়ানুবর্তিতা

হযরতজী অত্যন্ত সময়ানুবর্তী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বলতেন, যদি আমি সময়ানুবর্তী না হতাম তা হলে দ্বীনের অল্প-স্বল্প যা কিছু খিদমত হচ্ছে তা কখনো সম্ভব হতো না। হযরতজী সময়ানুবর্তিতা সর্ম্পকে এত সচেতন ছিলেন যে, একদা তাঁর উস্তাদ শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান রহ. তাশরীফ আনেন এবং হযরতজীর অতিথি হন। তিনি শায়খুল হিন্দ রহ.-এর খেদমাতের যাবতীয় আয়োজন সম্পন্ন করার পর যখন নিজের লেখা-লেখির সময় হল, তখন অত্যন্ত আদবের সাথে অনুমতি চেয়ে লেখার কাজে ব্যস্ত হন। কিন্তু লেখার কাজে তাঁর মন কোনমতেই বসল না। তাই অল্পক্ষণ পর শায়খুল হিন্দ রহ.-এর খিদমতে চলেগেলেন। এমন একটি মুহূর্তেও তিনি লেখার কাজ একেবারে ছেড়ে দেননি, কিছুটা হলেও করেছেন।

ষষ্ঠ কারণ : ইখলাস বা নিষ্ঠা

ষষ্ঠ কারণ হল ইখলাছ। তাই হযরতজী নিজের রচনা সম্ভারকে জীবিকার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেননি। এ জন্য হযরতজীর পক্ষ থেকে ব্যাপকভাবে অনুমতি রয়েছে যে, যে কেউ যত কপি ছাপাতে আগ্রহী ছাপাতে পারবে। বিভিন্ন প্রকাশনালয় হযরতজীর কিতাবাদী দ্বারা লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জনও করেছে এবং করছে।

জনৈক ইংরেজ হযরতজীকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি তাফসীর গ্রন্থ লেখে কত টাকা রুজি করেছেন? হযরতজী বলেন, এক টাকাও না। তিনি আশ্চার্যান্বিত হয়ে বলেন, এত বড় কিতাব লিখার এই কষ্ট কেন স্বীকার করলেন? হযরতজী বলেন, আমাদের বিশ্বাস, এই জীবনের পর অন্য একটি জীবন রয়েছে, যাকে আখিরাত বলা হয়। আমার প্রত্যাশা, সেই আখিরাতে আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে তার প্রতিদান দিবেন। এবং দুনিয়াতেও আমি উপকৃত হব। কারণ, যখন আমি দেখব আমার মুসলমান ভাইরা তা অধ্যয়ন করে উপকৃত হচ্ছে তখন আমি আনন্দিত হব।

সবচেয়ে বড় সতর্কতা যা হযরতজীর বৈশিষ্টসমূহের অন্যতম, তিনি তার কিতাবাদীর অনাকাঙ্ক্ষিত ভুলের উপর যখনই অবগত হতেন [নিজে নিজে বা কারো মাধ্যমে] তখন তা সংশোধন করে নিতেন এবং তা প্রকাশও করতেন। লিখনীর ক্ষেত্রে একটি ধারা বেছে নিয়েছেন ''তারজীউর রাজিহ'' "প্রাধান্যপ্রাপ্ত বিষয়ের দিকে প্রত্যাবর্তন করা" এই ধারা অব্যাহত ছিল। হযরতজী নিজের কোন সামান্য ভুলের উপরও যখন অবগত হতেন তৎক্ষণাত সেই মাসআলা থেকে তিনি ফিরে আসতেন এবং তা সংশোধন করে নিতেন। আর যে সকল বিষয়ে দ্বিধাগ্রস্ত হতেন সেসব ক্ষেত্রে উত্তর লিখার পর লিখতেন, অন্যান্য ওলামায়ে কিরাম থেকেও তাহকীক করে এর সমাধান জেনে নিবেন। এই বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. বলেন, ''তারজীউর রাজিহ'' বর্তমান সময়ের জন্য একটি অতিবিরল বিষয়। যা সালফে সালেহীনের মধ্যে ছিল। মাওলানা থানভীর স্বতন্ত্র মর্যাদা, পূর্ণ সততা ও নিষ্ঠা প্রমাণে এতটুকুই যথেষ্ট''।

হযরতজী অনেক ফাযেল ওলামায়ে কিরাম দ্বারা নিজের কিতাব যেমন 'বেহেশতী জেওর' 'এমদাদুল ফতোয়া' 'তাফসীরে বয়ানুল কুরআন'-এর উপর পুনরায় 'তাসহীহ' (সংশোধন) করিয়েছেন। যথসামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতির উপর অবগত হয়েছেন তা মূল কপি থেকে সংশোধন করে তারপর প্রকাশ করেছেন।

হযরত থানভী রহ.-এর রচনা আধিক্যতার উল্লেখিত বাহ্যিক কারণ সমূহ 'উসুল' বা নীতির মর্যাদা রাখে। আমরা যদি সফল কলামিস্ট ও প্রাজ্ঞ লিখক হতে চাই, আমাদেরও উচিত উল্লেখিত নীতির উপর আমল করা। এই নীতির সারাংশ হল, একজন লিখককে অব্যশই উৎসাহ ও উদ্দীপনা, উপস্থিত জ্ঞান, অনর্থক কাজ থেকে মুক্ত থাকা, কৃত্রিমতা ও কপটতা থেকে বেঁচে থাকা, সময়ানুবর্তিতা এবং মুখলিস বা নিষ্ঠাবান হওয়া একান্ত কর্তব্য।

অতএব আমাদের উচিত এই সকল সোনালী নীতির উপর আমল করে নিজের সর্বস্ব দিয়ে হলেও দ্বীনের খিদমতে সদা নিয়োজিত থাকা। আল্লাহ আমাদেরকে সেই তাওফীক দান করুন, আমীন ॥

লেখক: অনুবাদক ও প্রবন্ধকার
ফাজেল জামিয়া পটিয়া।

কোয়ান্টাম মেথড:-২
মুক্ত বিশ্বাস ভ্রান্ত বিশ্বাস

-মুফতী শরীফুল আজম

ঈমান ও কুফরের মাঝে ব্যবধান হচ্ছে কিছু আক্বীদা-বিশ্বাস। মুমিন হতে হলে ঐ সকল আক্বীদা-বিশ্বাসকে মনে প্রাণে মেনে নিতে হয়। এর ব্যতিক্রম হলে মুমিন হিসেবে গণ্য করা হয় না। বিশুদ্ধ আক্বীদা বিশ্বাস শিক্ষা দেওয়াই ছিল, যুগে যুগে প্রেরিত নবী রাসূলগণের অন্যতম মহান দায়িত্ব। সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- সেই ধারাবাহিকতায় জাহেলিয়্যাতের সকল ভ্রান্তবিশ্বাসের মূলোৎপাঠন করে গোড়াপত্তন করেছিলেন শুদ্ধ বিশ্বাসের। নবীজী -সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- কর্তৃক প্রচারিত ঐ সকল আক্বীদা বিশ্বাসের কোন একটি অস্বীকার করলে ঈমান থাকবে না। ইসলামের সকল আক্বীদা বিশ্বাসের খুটিনাটি বিষয়ে বিস্তারিত জ্ঞান থাকা জরুরী নয়, শুধু সামগ্রিকভাবে সকল বিষয়ে ঈমান রাখাই যথেষ্ট। তবে ছয়টি মৌলিক ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এমন রয়েছে, যেগুলোর প্রতি স্বতন্ত্রভাবে বিশ্বাস স্থাপন মুমিন হওয়ার জন্য আবশ্যক। এই ছয়টি বিষয়ের অন্যতম হচ্ছে 'তাকদীর' তথা ভাগ্যলিপি।

তাকদীরের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে, ফায়সালা করা, নির্ধারণ করা। শরীয়তের পরিভাষায় তাকদীর বলা হয় "সৃষ্টি জগতের ব্যাপারে অনাদিকালে নেয়া আল্লাহ তা'আলার পরিকল্পনা ও ফায়সালাকে।" তাকদীরের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আল্লামা মনযুর নু'মানী (রহ.) বলেন: "তাকদীর মানে এই কথাকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করা যে, পৃথিবীতে ভাল-মন্দ যাই ঘটছে সবই মহান আল্লাহর নির্দেশে ও ইচ্ছায় সংঘটিত হচ্ছে। যা তিনি অনাদিকাল থেকেই সিদ্ধান্ত করে রেখেছিলেন। এমন হতে পারে না যে, তিনি যেমন চান পৃথিবীর এই কারখানা তার বিপরীত চলবে। এরূপ হলেতো আল্লাহ তাআলার দুর্বলতা ও অক্ষমতা প্রতীয়মান হবে।" (মাআরেফুল হাদীস ১/৬৬)

কুরআন হাদীসের বহু স্থানে তাকদীরের কথা উল্লেখ রয়েছে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে: "বস্তুত তাদের কোন কল্যাণ সাধিত হলে তারা বলে যে, এটা সাধিত হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর যদি তাদের কোন অকল্যাণ হয় তবে বলে, এটা হয়েছে তোমার পক্ষ থেকে। বলে দাও এসবই আল্লাহর পক্ষ থেকে।" (সূরা নিসা-৭৮)

হাদীসে জিব্রাঈলের ঘটনা তো প্রসিদ্ধ। এই হাদীসে পুরো দ্বীনের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। ইসলাম, ঈমান ও ইহসান। এই তিনের সমষ্টিকে দ্বীন বলা হয়েছে। ঈমানের মধ্যে তাক্বদীর তথা ভাগ্যলিপির ভাল-মন্দের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। (মুসলিম শরীফ: হাদীস নং-১)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ -সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- ইরশাদ করেন: "আল্লাহ তাআলা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে সকল মাখলূকাতের ভাগ্য লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন। তখন আল্লাহর আরশ পানির উপর ছিল"। (মুসলিম শরীফ: হাদীস নং-২৬৫৩) এখানে ভাগ্য লিপিবদ্ধ করা থেকে উদ্দেশ্য হল ভাগ্য নির্ধারণ করা। পঞ্চাশ হাজার বছর বলে বহুকাল পূর্বে বুঝানো হয়েছে। (মাআরিফুল হাদীস: খণ্ড:-১, পৃ:-১৭৭)

তাকদীরের মধ্যে দু'টি বিষয়ের বিশ্বাস জরুরী। ১। তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস। ২। তাকদীরের ভালো মন্দ উভয়টির প্রতি বিশ্বাস। তাকদীর ভাল-মন্দ হওয়ার অর্থ সম্পর্কে আল্লামা সাঈদ আহমদ পালনপুরী (দা.বা.) বলেন, "ভাগ্য ভাল-মন্দ হওয়ার বিষয়টি মানুষের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ ভাগ্যলিপি মানুষের জন্য উপকারী হোক বা ক্ষতিকর, মিষ্ট হোক বা তিক্ত, মানুষের কাছে ভাল লাগুক বা না লাগুক সর্বাবস্থায় সকল বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস রাখতে হবে। যেমন ভাগ্যলিপি অনুযায়ী ঘি স্বাস্থ্যকর আর বিষ ক্ষতিকর। নেক আমল জান্নাতে নিয়ে যায় আর বদ আমল জাহান্নামের কারণ হয়। অর্থাৎ নেক আমল উপকারী ও বদ আমল অপকারী। শিশুর মৃত্যু অপছন্দনীয় আর বেচে থাকা পছন্দনীয়। মোট কথা পছন্দ ও অপছন্দ সব কিছুর প্রতি বিশ্বাস জরুরী। (রাহমাতুল্লাহিল ওয়াসি'আ ১/৬৬১)

আক্বীদার পরিধি এতই ব্যাপক যে, আসমান-জমিনের সকল মাখলূকাতের খুটিনাটি সকল বিষয় এর আওতাভুক্ত। কর্ম, কর্মকারণ ও কর্মফল সবই রয়েছে ভাগ্যলিপিতে। মানুষ কোন মাধ্যমটি অবলম্বন করে কোন বস্তু অর্জন করবে তার সবই উল্লেখ রয়েছে এতে।

এক সাহাবী নবীজী -সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা যে সকল ঝাড়-ফুঁক ব্যবহার করি বা নিরাময়ের জন্য যে ঔষধ ব্যবহার করি এবং যে সকল ক্ষতিকর জিনিষ আমরা পরিহার করে চলি এগুলো কি তাক্বদীরকে বদলে দিতে পারে? নবী (সা) উত্তর দিলেন যে, এসব বস্তুও তাকদীরের অন্তর্ভুক্ত।" (তিরমিযী শরীফ হাদীছ নং- ২১৪৮)

অর্থাৎ মানুষ কোন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য যে সকল তদবীর করে থাকে, এর জন্য যে মাধ্যম অবলম্বন করা হয় তার সবই ভাগ্যলিপিতে নির্ধারিত আছে। কোন ব্যক্তির রোগ কোন বস্তুর ব্যবহারে উপশম হবে সেগুলোও পূর্ব থেকেই ঐ ভাগ্যলিপিতে বিদ্যমান আছে। কাজেই তাকদীর অনুসারেই সে সুস্থ হচ্ছে। ঔষধের ক্ষমতায় নয়। এটাই হচ্ছে তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস।

মানুষের মধ্যে কেউ বোকা হয় আবার কেউ বুদ্ধিমান হয়, কেউ দূরদর্শী হয় আবার কেউ অপরিণামদর্শী, এসকল বিষয়ও তাক্বদীরে ধার্য করা আছে। হাদীসে আছে: "প্রত্যেক বস্তু তাকদীর অনুযায়ী হয়ে থাকে, এমন কি অজ্ঞ ও বিজ্ঞ হওয়াটাও তাক্বদীরের প্রতিফলন"। (মুসলিম শরীফ: হাদীস নং২৬৫৫)

তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ছাড়া বান্দার দান খয়রাত, ইবাদত বন্দেগী কিছুই কবুল হবে না। হাদীস শরীফে আছে: "যদি তুমি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ আল্লাহর রাস্তায় খরচ কর তা আল্লাহর কাছে কবুল হবে না যদি তুমি তাকদীরে বিশ্বাসী না হও এবং একথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস না কর যে, যা কিছু তোমার উপর বর্তাবার রয়েছে তা থেকে কখনও তুমি রেহাই পাবে না আর যা কিছু তোমার হাত ছাড়া হওয়ার তা কখনও তুমি পাবে না। এর বিপরীত বিশ্বাস নিয়ে যদি তুমি মৃত্যু বরণ কর তবে জাহান্নামে নিপতিত হবে।" (আবু দাউদ: হাদীস নং-৪৬৯৯, ইবনে মাজাহ: হাদীস নং-৭৭)

মানুষের কাজ হচ্ছে তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস রেখে চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। মানুষ চেষ্টার মালিক, আল্লাহ দেওয়ার মালিক। ভাগ্যে থাকলে পাবে, অন্যথায় শত চেষ্টা করেও ব্যর্থ হবে। এভাবে চেষ্টা করার এখতিয়ার আল্লাহ তাআলা মানুষের মাঝে রেখেছেন। কিন্তু এই এখতিয়ার স্বাধীন নয় বরং আল্লাহর ইচ্ছাধীন। কারণ মানুষের সকল চেষ্টার মূল চালিকা শক্তি হচ্ছে মনের আগ্রহ। মনে আগ্রহ তৈরী হওয়ার পরই মানুষ কাজের জন্য চেষ্টা শুরু করে। আর মনের ইচ্ছা সম্পূর্ণ আল্লাহ তা'আলার নিয়ন্ত্রণাধীন। হাদীস শরীফে এসেছে: "সকল মানুষের মন আল্লাহর কুদরতী দুই আঙ্গুলের মাঝে একাত্মার মত রয়েছে। তিনি যে দিক ইচ্ছা মনকে ঘুরিয়ে দেন।"। (মুসলিম শরীফ: হাদীস নং-২৬৫৪) কাজেই মন আল্লাহর ইচ্ছা ও তাকদীরের বাইরে কোন কাজ করতে পারে না। যা করে সব ভাগ্যলিপি অনুসারে করে। ভাগ্যকে বদলাতে পারে না, বা ভাগ্য রচনা করতে পারে না।

উমাইয়া শাসনামলের প্রথম দিকে মুসলমানদের মধ্যে একটি ভ্রান্ত দলের বহি:প্রকাশ হয়ে ছিল। যারা ঈমানের অন্যতম শাখা তাক্বদীরকে অস্বীকার করত। তারা বিশ্বাস করত যে, মানুষের কাজ কর্মের স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা নন। বরং সবই মানুষের ব্যক্তিগত অর্জন। সমগ্র প্রাণী জগতের কর্মে আল্লাহর কোন পরিকল্পনা নেই। মানুষ নিজেই নিজের সব কর্ম সম্পাদন করতে সক্ষম। ভ্রান্ত এই দলটি তৎকালীন যুগে খুবই আলোড়ন সৃষ্টি করে ছিল। তাদের বলা হতো 'কাদরিয়া'। ইসলামী আক্বীদা ও দর্শনের কিতাবাদীতে এই ফেরকার বহু আলোচনা ও তাদের ভ্রান্ত মতবাদের খণ্ডন বিদ্যমান রয়েছে। এক সময় এ দলটি বিলুপ্ত হয়ে যায়। দীর্ঘদিন যাবৎ এই মতবাদের প্রচার বন্ধ ছিল। কিন্তু দু:খজনক হলেও সত্য যে, বর্তমানে আমাদের দেশে কোয়ান্টাম মেথড এর নামে নবরূপে 'কাদরিয়া' ফেরকার মতবাদ পূনরায় প্রচার শুরু হয়েছে। মুক্ত বিশ্বাসের নামে কৌশলে তাকদীরকে অস্বীকার করে চলছে। নিরাময়ের ছদ্মবেশে মেডিটেশনকে হাতিয়ার বানিয়ে মুসলমানদের ঈমান-আকীদা ধ্বংস করার পথ বেছে নিয়েছে এরা। মুক্ত বিশ্বাস নামে নতুন এক জীবনদৃষ্টির প্রচারণা শুরু করেছে তারা।

কোয়ান্টামের 'মুক্ত বিশ্বাস'র বক্তব্য হল, মানুষ নিজেই পারে নিজের অবস্থাকে বদলে দিতে। অর্থাৎ নিজেই নিজের ভাগ্য রচনা করতে পারে এবং দুর্ভাগ্যকেও বদলে দিতে পারে। সকল কর্মের উৎস মানুষের মন ও মস্তিস্ক। কোয়ান্টামের ৩০০তম কোর্সপূর্তি স্মারক "কোয়ান্টাম উচ্ছ্বাস" এর একদম শুরুতে একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে। যার শিরোনাম হলো "মুক্তবিশ্বাস বদলে দেয় জীবন।" উক্ত প্রবন্ধ থেকে কিছু কিছু বিষয় এখানে তুলে ধরা হলো। তবে এর পূর্বে লক্ষণীয় বিষয় হলো, বিশ্বাস কখনও মুক্ত হতে পারে না। কারণ বিশ্বাস মানেই হচ্ছে নির্দিষ্ট পরিধির ধ্যান-ধারণা মনে প্রাণে বদ্ধমূল করে নেয়া। মুক্ত মানে উন্মুক্ত, যার কোন পরিধি বা গণ্ডি থাকে না। তাই বিশ্বাস শব্দের বিশেষণ হিসেবে মুক্ত শব্দটি বেমানান। বিশ্বাস হয় শুদ্ধ হবে নয় ভ্রান্ত হবে। বিশ্বাস মুক্ত হতে পারে না। সে যাই হোক কোয়ান্টামের মুক্ত

বিশ্বাস হচ্ছে একটি ছোট বাক্য "আমি পারি আমি পারবো"। অর্থাৎ সকল কাজ কর্ম, চাওয়া-পাওয়ার ভিত্তি এই একটি বিশ্বাসই। এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে মানুষ নিজের ভাগ্য গড়তে পারে। অর্জন করতে পারে সকল লক্ষ্য। বদলে দিতে পারে জীবন। এই মুক্ত বিশ্বাসের প্রথম প্রভাব পড়ে মনে। মন প্রোগ্রাম পাঠায় মস্তিস্কে। আর মস্তিষ্ক মানুষের পারার ইচ্ছাটা বাস্তবতায় রূপান্তরিত করে"। (কোয়ান্টাম উচ্ছ্বাস পৃ: ৬)

ইসলামের দৃষ্টিতে "আমি পারবো" বলে শত ভাগ নিজের উপর ভরসা করা এবং মন মস্তিস্কের ক্ষমতা বলে সকল লক্ষ্য অর্জন করার বিশ্বাস শরীয়ত পরিপন্থী। মানুষকে 'ক্বাদেরে মুতলাক' তথা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মনে করা একটি ভ্রান্ত ও কুফরী বিশ্বাস। বস্তুত আল্লাহর হুকুম ছাড়া মানুষের পারার ইচ্ছা পূরণ তো দূরের কথা স্বয়ং ইচ্ছাটাও সৃষ্টি হতে পারে না। তাই কোয়ান্টামের এই মুক্ত বিশ্বাস পবিত্র কুরআন মজীদের সূরা আত-তাকভীরের ২৯ নং আয়াতের সম্পূর্ণ পরিপন্থী ও সাংঘর্ষিক। উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন: "তোমরা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অভিপ্রায়ের বাইরে অন্য কিছুই ইচ্ছা করতে পার না"।

কোয়ান্টামের মুক্ত বিশ্বাসের মূল ভিত্তি হচ্ছে বিজ্ঞানের একটি থিউরী। তা হলো "মন প্রোগ্রাম পাঠায় মস্তিষ্কে আর মস্তিষ্ক ইচ্ছাকে বাস্তবায়ন করে"। তাই আমরা বলতে পারি মন এক বিশাল স্বতন্ত্র প্রক্রিয়া যা পরিচালিত করে মস্তিষ্ককে। আর মস্তিষ্ক পরিচালিত করে আপনার সকল শরীরবৃত্তীয় কার্যক্রমকে"। (কোয়ান্টাম উচ্ছ্বাস-পৃ:৬) বিজ্ঞানের এই দর্শন অনুযায়ী মানুষের সকল কর্মের স্রষ্টা ও উৎস হচ্ছে মস্তিষ্ক। আর ইসলামের বক্তব্য হচ্ছে মানুষ ও তাদের সকল কর্মের স্রষ্টা হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলা। বিজ্ঞানের দর্শন হলো শরীর পরিচালিত হয় মস্তিষ্কের সাহায্যে আর মস্তিষ্ক পরিচালিত হয় মনের সাহায্যে। কিন্তু মন পরিচালিত হয় কার মাধ্যমে একথা বলতে নাস্তিক বিজ্ঞানীরা নারাজ।

আসলে আল্লাহ তা'আলার কুদরতকে স্বীকার করার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা ইচ্ছাকৃতভাবে খামোশ হয়ে যায়। তাই মনের নিয়ন্ত্রণ কার হাতে একথা স্বীকার না করে মনকে "স্বতন্ত্র প্রক্রিয়া" বলে চালিয়ে দেয়া হয়েছে। যা নাস্তিক্যবাদের পরিচয় বহন করে। অথচ হাদীস শরীফে বলা হয়েছে: "সকল মানুষের মন আল্লাহর দু'অঙ্গুলির মাঝে একাত্মার মত। তিনি মনকে যে দিকে ইচ্ছা ঘুরান।" (মুসলিম শরীফ, হাদীস নং- ২৬৫৪) তাই মনকে স্বতন্ত্র প্রক্রিয়া বলা উক্ত হাদীসের পরিপন্থী। এই হাদীসের সাথে বিজ্ঞানকে মিলাতে গেলে বলতে হবে, আল্লাহ তা'আলাই মানুষের মন নিয়ন্ত্রণ করে। আবার আল্লাহ তা'আলা এমন নিয়ম চালু করেছেন যে, মন মস্তিষ্ককে পরিচালিত করবে এবং মস্তিষ্কের মাধ্যমে শরীরের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিচালিত হবে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলাই হলেন মানুষের সকল কর্মের একমাত্র নিয়ন্ত্রক। মন ও মস্তিস্কের ক্ষমতা মূলত আল্লাহর ইচ্ছাধীন পরিচালিত হয়। অতএব মনের স্বতন্ত্র ক্ষমতার ভিত্তিতে "আমি পারি আমি পারব" এ ধরনের মুক্ত বিশ্বাস কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বিশ্বাস বলে গন্য হবে।

কোয়ান্টামের উক্ত প্রবন্ধে আরো বলা হয়েছে, "তাহলে রোগ, সুখ, অভাব, ব্যর্থতা ও হতাশাকে কেন প্রশ্রয় দেবেন? যেখানে আপনি নিজেই পারেন নিজের সব কিছু বদলে দিতে।.... প্রয়োজন শুধু মুক্ত বিশ্বাসের। মুক্ত বিশ্বাসই বদলে দিতে পারে আপনার জীবনের সব কিছু।" (কোয়ান্টাম উচ্ছ্বাস-পৃ:৬)

এই বাক্যগুলো থেকে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, জীবনের সকল প্রতিকুল অবস্থাকে বদলে দেয়ার ক্ষমতা মানুষের রয়েছে। মুক্ত বিশ্বাসের ক্ষমতা বলে মানুষ ভাগ্যের এসকল লিখনীকে বদলে দিতে পারে।(নাউযু বিল্লাহ) আর মুক্ত বিশ্বাস না থাকলে কি ক্ষতি তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে উক্ত নিবন্ধে লেখা হয়েছে: "বিশাল সম্ভাবনা নিয়ে পৃথিবীতে আসার পরও এদের সকল স্বপ্ন অধরা থেকে যায়। (কোয়ান্টাম উচ্ছ্বাস-পৃ:৭) অর্থাৎ যা পাওয়ার ছিল তাও হারায়। অথচ হাদীস শরীফের ভাষ্যানুযায়ী মানুষের যা প্রাপ্ত রয়েছে তা কেউ ফেরাতে পারবে না। আর যা হাতছাড়া হওয়ার তা কখনো পাবে না। এর বিপরীত ঈমান নিয়ে মৃত্যুবরণ করলে জাহান্নাম অবধারিত। বিস্তারিত হাদীস পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। কাজেই সবকিছু বদলে দেয়ার মুক্তবিশ্বাস এই হাদীসের সম্পূর্ণ বিপরীত ও সাংঘর্ষিক। সুতরাং এমন মুক্ত বিশ্বাস একটি ভ্রান্ত ও কুফরী বিশ্বাস।

উক্ত প্রবন্ধে সরাসরি তাক্বদীর ও এর ভাল-মন্দের বিশ্বাসকে কটাক্ষ করে বলা হয়েছে, "মুক্তবিশ্বাস যদি সবকিছু এত সহজে বদলে দেয় তাহলে দুর্দশাগ্রস্তরা, অভাবগ্রস্তরা, রোগ-শোকে ভারাক্রান্তরা কেন এই সহজপথকে সহজে গ্রহণ করে না? কারণ খুব সহজ। তারা বিশ্বাস করে নেতিবাচকতায়, বিশ্বাস করে দুর্ভাগ্যে, বিশ্বাস করে অলীকে।" (ঐ -পৃ:৭)

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, ভাগ্য ও ভাগ্যের ভালো মন্দ উভয় বিষয়ের বিশ্বাস ঈমানের অংশ।

বাকি অংশ পৃ: ২৮ ক: ৩

স্মরণ

ফিদায়ে মিল্লাত আওলাদে রাসূল সা. হযরত মাওলানা সায়্যিদ আস'আদ মাদানী রহ.

মাওলানা আনোয়ার হোসাইন

ইসলামের ব্যাপক প্রচার-প্রসার, সমাজ সংস্কার, মানব সেবা, এবং আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে যে সকল মহামনীষীর স্মৃতি দুনিয়াব্যাপী মানুষের হৃদয়ে গ্রথিত আছে তাদের অন্যতম হচ্ছেন ফিদায়ে মিল্লাত, আওলাদে রাসূল সা. হযরত মাওলানা সায়্যিদ আসআদ মাদানী রাহ.।

জন্ম: তিনি ৬ যিলক্বদ ১৩৪৬হিজরী মোতাবেক ২৭ এপ্রিল ১৯২৮ইং রোজ শুক্রবার ভারতের উত্তর প্রদেশের সাহারানপুর জেলার দেওবন্দে উপমহাদেশে ইসলামী জাগরণের অগ্রদূত শাইখুল ইসলাম, কুতবুল আলম হযরত আল্লামা সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী রহ. এর ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মাতা ছিলেন হাকীম সৈয়দ গোলাম আলী রহ. এর কন্যা।

বংশ: হযরত ফিদায়ে মিল্লাত রহ. পিতার দিক থেকে আওলাদে রাসূল সা. তথা হুসাইনী সায়্যিদ ছিলেন। তাঁর বংশপরম্পরা শহীদে কারবালা হযরত হুসাইন রা. পর্যন্ত পৌঁছে।

শিক্ষা : হযরত ফিদায়ে মিল্লাত রহ. প্রাথমিক শিক্ষা মায়ের কাছে লাভ করেন। ১৩৫৫ ইং সনে ৯বছর বয়সে তাঁর মা' ইন্তিকাল করেন। তখন তিনি পিতা হযরত শায়খুল ইসলাম সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী রহ. এর খলীফা দারুল উলূম দেওবন্দের উস্তাদ হযরত মাওলানা কারী আসগর আলী সাহেব রহ. এর তত্ত্বাবধানে শিক্ষা লাভ করতে থাকেন। কিছু দিন পর দারুল উলূম দেওবন্দে ভর্তি হয়ে নিয়মিত শিক্ষার স্তরসমূহ সমাপ্ত করে ১৩৬৫ হিজরী মোতাবেক ১৯৪৫ইং সনে দাওরায়ে হাদীছের সর্বোচ্চ ডিগ্রী লাভ করেন। এর পর দু'বছর বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চশিক্ষা অর্জন করেন। ১৯৪৭ সনে দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে শিক্ষা সমাপন করেন। তাঁর উস্তাদগণের মধ্যে ছিলেন: আপন পিতা শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী রহ., ইমামুল মা'কূলাত হযরত মাওলানা ইবরাহীম বলিয়াভী রহ., শায়খুল আদব হযরত মাওলানা এ'যায আলী রহ., হযরত আল্লামা সায়্যিদ মিয়া আসগর হুসাইন রহ. হযরত মাওলানা মুফতী সায়্যিদ মাহদী হাসান রহ. প্রমূখ।

শিক্ষা সমাপ্ত করে হযরত ফিদায়ে মিল্লাত মদীনা শরীফ গমনপূর্বক কিছু কাল সেখানে অবস্থান করেন।

তাদরীস: হযরত ফিদায়ে মিল্লাত রহ. ২৮ শাওয়াল ১৩৭০ হিজরী মোতাবেক ১৯৫০ ইং সনে তিনি দারুল উলুম দেওবন্দের শিক্ষকদের কাফেলায় শামিল হন। তখন থেকে ১৩৮২ হিজরী পর্যন্ত একযুগ কাল তিনি দেওবন্দের উস্তাদ হিসেবে শিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন খেদমাত আঞ্জাম দেন। এরপর তিনি দেশ জাতির ব্যাপক ভিত্তিক খেদমত আঞ্জাম দেয়ার জন্য ময়দানে অবতীর্ণ হন।

আধ্যাত্মিক শিক্ষা: শিক্ষা জীবন সমাপনান্তে তিনি আপন পিতা শায়খুল ইসলাম হযরত সায়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী রহ. এর হাতে বাইআত হয়ে আধ্যাত্মিকতার পথে সাধনা করতে থাকেন। নিজ পিতার পাশে থেকে তিনি রূহানী ইলমের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে থাকেন। পিতার ইন্তিকালের পর পিতার খলীফাগণ তাঁকে খেলাফত প্রদান করেন। প্রখ্যাত আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব শাইখুল হাদীছ হযরত মাওলানা যাকারিয়া রহ.ও তাঁকে বিশেষভাবে খেলাফত প্রদান করেন এবং বাইআতের সিলসিলা শুরু করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। বাইআত প্রত্যাশী সালেকদের ব্যাপক আগ্রহ এবং মুরব্বীদের পরামর্শে হযরত ফিদায়ে মিল্লাত রহ. বাইআত ও ইরশাদের কর্ম ধারা আরম্ভ করেন। ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, সৌদিআরব মধ্যপ্রাচ্যসহ ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা প্রভৃতি দেশের হাজার হাজার মানুষ হযরত মাওলানার পবিত্র হাতে বাইআত গ্রহণ করে আধ্যাত্মিকতার পথ চলা আরম্ভ করেন।

রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ: হযরত ফিদায়ে মিল্লাত রহ. ভারতের রাজনীতি ও সংসদীয় রাজনীতিতে ব্যাপক অবদান রেখেছেন। জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ এর পক্ষে রাজ্যসভার

সদস্য, জাতীয় কংগ্রেস এর সদস্য হিসেবে তিনি দেশ, জাতি বিশেষ করে ভারতের মুসলিম মিল্লাতের বহুবিদ খেদমাত আঞ্জাম দিয়েছেন। তিনি ১৯৬০ ইং সনে উত্তর প্রদেশ শাখা জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ এর সভাপতি নির্বাচিত হন। এ সময় তিনি গোটা প্রদেশে দ্বীনি শিক্ষা বোর্ডের মাধ্যমে দ্বীনি শিক্ষা ও কৃষ্টি কালচারের সংরক্ষণে বিরাট ভুমিকা রাখেন। এ সময় বাবরী মসজিদ রক্ষায় নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পাশাপশি ইউপি জমিয়ত এবং সুন্নী সেন্ট্রাল ওয়াকফ বোর্ড এর পক্ষ হতে ১৯৬১ সনে ১৮ ডিসেম্বর ফয়েজাবাদ কোর্টে মামলা দায়ের করেন। তিনি ১৯৬৩ ইংরেজীতে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের মহাসচিব নির্বাচিত হন। ১৯৭৩ ইং সনের আগস্টে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ এর সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৬৮ সনে তিনি রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচিত হন। তখন থেকে ১৯৯৪ইং পর্যন্ত মোট ১৮বছর সংসদ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। জাতীয় সংসদে মুসলমানদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে হযরতের ভুমিকা ছিল সর্বমহলে প্রশংসিত ও সমাদৃত। বাবরী মসজিদ সমস্যা, মুসলিম সংস্কৃতির লালন, ৩ তালাক, ওয়াকফ সম্পত্তি, আসাম সমস্যাসহ মুসলিম উম্মাহের বিভিন্ন জাতীয় বিষয়ে হযরতের জোরালো ভূমিকা বিস্ময়কর অবদান ছিল।

বাংলাদেশে হযরতের অবদান:

বিশ্ব ব্যাপী অসংখ্য অবদানের পাশাপাশি বাংলাদেশেও বৃহৎ অবদান রেখেগেছেন হযরত ফিদায়ে মিল্লাত রহ.। আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে এদেশে তাঁর অসংখ্য মুরিদান এবং খলীফা রয়েছেন। তিনি এদেশে প্রায় প্রতিবছর সফর করে কওমী মাদরাসাসমূহ এবং ওলামায়েকেরামকে নিজ অভিভাবকত্ব দানে ধন্য করতেন। এদেশের বহু দ্বীনি কাজে তাঁর মুরুব্বিয়ানা ছিল চোখে পড়ার মত। বাংলাদেশে প্রায় প্রতিটি বড় বড় জেলা শহরে আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলনের নামে ইসলামী সম্মেলন সংস্থার অধীনে মাস ব্যাপী যে সম্মেলনগুলো হচ্ছে, হযরত ফিদায়ে মিল্লাত রহ. ছিলেন এসবের মূল রূপকার ও পরিকল্পক। তিনিই আজ থেকে প্রায় ২৮ বছর পূর্বে দেশের বড় বড় জেলা শহরসমূহে এরূপ সম্মেলন করার জন্য চট্টগ্রামের ওলামায়েকেরামকে আকৃষ্ট করেছিলেন। এমনিভাবে এদেশের বিভিন্ন দ্বীনি ও কল্যাণমূলক কাজে হযরত ফিদায়ে মিল্লাত রহ. এর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অংশ ছিল। মোটকথা ফিদায়ে মিল্লাত হযরত মাওলানা আসআদ মাদানী রহ. এর পুরো কর্মজীবনই ছিল পরোপকারিতা ও মুসলিম মিল্লাতের কল্যাণ সাধন ও খালেছ ইসলাম প্রচারে একটি বেনজীর আদর্শ জীবন। তাঁর এই বিশাল অবদানের আলোকরশ্মি আজ সারা দুনিয়ায় প্রসারিত ও প্রশংসিত।

ইত্তিকাল : ৭ মহররম ১৪২৭ হিজরী মোতাবেক ৬ ফেব্রুয়ারী ২০০৬ইং সোমবার সন্ধ্যা ৫টা ৪৫ মিনিটে এই মহান ব্যক্তিত্ব ইহকাল ত্যাগ করে জান্নাতবাসী হয়ে যান। ৭ ফেব্রুয়ারী ২০০৬ইং সকালে দারুল উলূম দেওবন্দে তাঁর বিশাল নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। দেওবন্দের ঐতিহ্যবাহী মাকবারায়ে কাসেমীতে তাঁকে দাফন করা হয়।

২৬ পৃষ্ঠার পর:

নেতিবাচক ভাগ্য বা দূর্ভাগ্যকে অস্বীকার করলে ঈমান থাকবে না। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে: "পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে বিপদাপদ আসে তা সবই আমি কিতাবে অর্থাৎ লওহে মাহফুজে জগৎ সৃষ্টির পূর্বেই লিখে দিয়েছিলাম" (সূরা আল-হাদীদ-২২) পৃথিবীর বিপদাপদ বলে দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, ফসলহানি, বাণিজ্যে ঘাটতি, ধন সম্পদ বিনষ্ট হওয়া, বন্ধু-বান্ধবের মৃত্যু ইত্যাদি এবং ব্যক্তিগত বিপদাপদ বলে সর্বপ্রকার রোগ, ব্যাধি, ক্ষত, আঘাত ইত্যাদি বুঝানো হয়েছে। (তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন)

অতএব ইতিবাচক-নেতিবাচক তাকদীরের ভালো মন্দ সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে হওয়ার বিশ্বাসের নাম ঈমান বিল ক্বদর। তাকদীর বা এর কোন এক অংশকে অস্বীকার করা হলে আল্লাহ তা'আলার ইলম ও কুদরাতকে অস্বীকার করা হবে। কারণ অনাদীকাল থেকে ভালো-মন্দ সব বিষয় নির্ধারণ তাঁর ইলম ও কুদরতেরই বহি:প্রকাশ। সুতরাং নির্দ্বিধায় ও নি:সন্দেহে বলা যায় যে, ভাগ্যলিপির ভালোমন্দকে না মানার 'মুক্ত বিশ্বাস' একটি ভ্রান্ত বিশ্বাস ও কুফরী মতবাদ।

মারকাযের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে
কায়েদে মিল্লাত মাওলানা ফজলুর রহমান দা. বা. (পাকিস্তান)

ভাষান্তরঃ মাওলানা জসিম উদ্দীন কাসেমী

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন আমি মানুষ ও জিনকে একমাত্র আমারই ইবাদত-বন্দেগী করার জন্য সৃষ্টি করেছি। আল্লাহ তা'লার এই হুকুমের মাধ্যমেই মানুষ ও জিন উভয় জাতি দুইভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একদল মুমিন অপর দল কাফির। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন, তা একমাত্র মুমিনদের মাধ্যমেই প্রকাশ পায়। তা হলো আল্লাহর বন্দেগী বা গোলামী। পৃথিবীতে তারা কত সৌভাগ্যবান যারা এক আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সেই ঈমান অনুযায়ী আমল করে। এটাই ছিল উম্মতের প্রতি রাসূল সা. এর একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। মহানবী -সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- ইরশাদ করেন: انما بعثت معلما অর্থাৎ "উম্মতের জন্য আমি শিক্ষক হিসেবেই প্রেরিত হয়েছি"। নবী -সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- অন্যত্র ইরশাদ করেন بعثت لاتمم مكارم الاخلاق "আমি পুরোপুরি উত্তম চরিত্র বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রেরিত হয়েছি।" ইলম তথা ঐশী জ্ঞান এবং আখলাক তথা উত্তম চরিত্র, উভয়ের সমন্বয়ে গঠিত হয় মানব সমাজের সুন্দর জীবনব্যবস্থা। ইলম ও আখলাক উভয় প্রকারের শিক্ষা ভারত উপমহাদেশের একমাত্র কওমী মাদরাসাগুলো (দেওবন্দী মাদরাসা) ছাড়া অন্য কোথাও দেয়া হয় না। আমাদের মাদরাসাগুলোতে শিক্ষা যেমন দেওয়া হয় সাথে সাথে তারবিয়্যাত তথা চারিত্রিক প্রশিক্ষণও দেয়া হয়। ইলম অনুযায়ী আমল করার জন্য উৎসাহও প্রদান করা হয়। এতদুভয় গুণাবলীর কারণে আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে খিলাফতের মত বড় মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজিদে খিলাফতের আয়াত তথা انى جاعل فى الارض خلفية এবং এর পরেই ইলমের আয়াত وعلم ادم الاسماء ইরশাদ করেছেন। যাতে মানবজাতি ইলম অনুযায়ী আমল করতে পারে, ভালো থেকে উপকৃত হতে পারে এবং ক্ষতি থেকে বাঁচতে পারে। তা থেকে বুঝা গেল, ফিৎনা ফাসাদমুক্ত সমাজ গঠন করতে হলে ঐশী জ্ঞানের একান্ত প্রয়োজন। তাই মানুষকে হয়তো আলেম (কুরআন সুন্নাহর জ্ঞানে জ্ঞানী) হতে হবে, অন্যথায় কোন হক্কানী আলেমের দিকনির্দেশনা মেনে চলতে হবে।

এভাবে যারা সুন্দর সমাজ ও দেশ গঠনের লক্ষ্যে কাজ করে যাবেন, তারাই সমাজের নেতৃত্ব প্রদান করবে এবং অন্যরা তাঁদের নেতৃত্বাধীন জীবনযাপন করবে। এভাবেই হয়ে যাবে কিছু সংখ্যক নেতা আর কিছু পরিচালিত। এটাই হলো প্রকৃতির নিয়ম। আজ পৃথিবীতে যারা সব মানবজাতি সমান বলে আওয়াজ তোলে, তারা যেন এই প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

এখানে যারা আছেন সকলে প্রায় ইলমে দ্বীন পিপাসু ছাত্র। আল্লাহ আপনাদেরকে এই ইলমে দ্বীনের সাথে সম্পৃক্ত রাখুন। আমীন। আল্লাহর কাছে আপনাদের কত বড় মর্যাদা! রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

ان فى بيت من بيوت الله قوما يتدرسون فيما بينهم الا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة۔

এই হাদীসে তালেবে ইলমদের জন্য তিনটি পুরস্কারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ১। তাদের উপর সকীনা তথা প্রশান্তি অবতীর্ণ হয়। ২। আল্লাহর রহমত তাদেরকে আবরিত করে রাখেন। ৩। ফেরেশতাগণ তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখেন।

তিন জিনিসের সঙ্গে তালেবে ইলমদের ভাল সম্পর্ক হওয়া উচিৎ। ১। উস্তাদের সাথে ভালো ব্যবহার। ২। নিজের মাদরাসার সঙ্গে অত্যন্ত ভালবাসা। ৩। কিতাবের আদব ও ভক্তি বজায় রেখে চলা। একথা সবসময় মনে রাখতে হবে, উস্তাদগণ হলেন পিতৃতুল্য, মাদরাসা হলো মায়ের মত এবং কিতাব হলো (রূহানী) আহার্য। বস্তুগতভাবে মানুষ এই তিনটি বস্তু (পিতা-মাতা ও খাদ্য)এর মুখাপেক্ষী। তদ্রূপ রূহানীভাবে মানুষ উস্তাদ, মাদরাসা এবং কিতাবের মুখাপেক্ষী।

ইলমে দ্বীন অর্জন করে সমাজে পদার্পণ করে দ্বীনকে মানুষের সামনে নম্র ও ভদ্রভাবে উপস্থাপন করতে হবে। যাতে মানুষ আপনার কাছে আসে। দ্বীনকে এমনভাবে উপস্থাপন করা যাবে না, যাতে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে এবং দ্বীনের বিধানসমূহ হেয় প্রতিপন্ন হয়। সেরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করা হলে আপনার কাছ থেকে মানুষ দূরে সরে যাবে। কথা শুনতে আগ্রহী হবে না, বরং দ্বীন থেকে মানুষ মাহরূম যাবে। এটাই পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক এভাবে ইরশাদ করেছেন:

ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى احسن ۔

"আহবান কর তোমার প্রভুর পথে হিকমাত ও উত্তম নসীহতের মাধ্যমে, এবং তাদের সাথে বিতর্কে অবলম্বন কর উত্তম উপায়।"

আল্লাহ পাক আমাদেরকে উত্তম পদ্ধতিতে দ্বীন প্রচার করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

মোবাইল ফোন :
ক্ষতি ও ঝুঁকির মুখে স্বাস্থ্য-সভ্যতা-সমাজ-১

রিজওয়ান রফীক জমীরাবাদী

যোগাযোগের বিড়ম্বনা, খবর আদান প্রদানের অস্বাভাবিক কষ্ট এখন বিস্মৃত ইতিহাস। নিকট অতীতেও যেখানে আপনজনের কাছে একটা খবর পৌঁছুতে দিন, সপ্তাহ কিংবা মাস গুনতে হতো, সেখানে এখন সবকিছু মুহূর্তেই সাধিত হয়। বলতেগেলে এখন অতি যোগাযোগই বিড়ম্বনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসব প্রযুক্তিরই ব্যাপক উৎকর্ষযজ্ঞ। মোবাইল প্রযুক্তি দুনিয়াকে করে দিয়েছে অতি নিকটে। পরিণত করেছে বিশ্বগ্রাম (Global village) গ্লোবাল ভেলেজে। এক পাড়ে চিৎকার দিলে যেমন অন্য পাড়ে শোনা যায় বিশ্বটাই যেন এখন সেরূপ। মুহূর্তেই সালাম কালাম, আদান প্রদান এবং সবকিছু।
কিন্তু প্রযুক্তি যখন অযৌক্তিক বিচরণ শুরু করে, উপকারের বিপরীতে অপকার বাড়ায়, শান্তির বদলে অস্থিতিশীলতা বৃদ্ধি করে, তখন এ ব্যাপারে সতর্কতা ও সাবধানতার কথা আসে। মুসলিম উম্মাহের মধ্যে এরূপ ব্যতিক্রম আজকের নয়। বহুদিন আগে থেকে বহু কিছুতেই পরিলক্ষিত হয়েছে। যে সব বিষয়ের ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহকে ধর্মীয় কর্ণধার উলামায়ে কেরাম বিশেষ করে আকাবির উলামায়ে দেওবন্দ নিজেদের দ্বীনি ও রাস্ট্রীয় দায়িত্ব মনে করে সবসময় সচেতন ও সাবধান করে এসেছেন। সম্প্রতি এই মোবাইল প্রযুক্তির অপব্যবহার ও ক্ষতি রোধে উলামায়ে কেরাম মুসলিম মিল্লাতকে সতর্ক করে দিতে কিছু কিছু খিদমাত আঞ্জাম দিয়েছেন। পাকিস্তান, ভারত, মধ্যপ্রাচ্য এবং বাংলাদেশের উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে বিভিন্ন আর্টিক্যাল, প্রবন্ধ-নিবন্ধ এবং ফতওয়া প্রকাশ করেছেন। তবে এসবের মধ্যে বাংলাদেশের কওমী অঙ্গনের শীর্ষ মুরব্বী বসুন্ধরা ইসলামিক রিসার্চ সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা মহাপরিচালক ফক্বীহুল মিল্লাত হযরত মাওলানা মুফতী আব্দুর রহমান সাহেব দীর্ঘ দিন আগে থেকে যে পদক্ষেপটি গ্রহণ করেছেন তা বর্তমানে একান্ত বাস্তব, যুগোপযোগী ও সৃজনশীল মনে হয়। আজ থেকে প্রায় ১২ বছর পূর্ব থেকে তিনি ছাত্রদের মোবাইল ব্যবহারের ক্ষেত্রে নেতিবাচক মত প্রকাশ করে এসেছেন। এমনকি নিজ পরিচালনাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহে ছাত্রদের মোবাইল ব্যবহারের উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে এসেছেন তিনি। এসকল পদক্ষেপ উলামায়ে কেরামের দূরদৃষ্টি ও রূহানী দৃষ্টির প্রখরতারই প্রমাণ বহন করে। কারণ হযরত ফক্বীহুল মিল্লাত দা.বা. যখন থেকে এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন, তখন কিন্তু মোবাইল প্রযুক্তির তথাকথিত এত উন্নতি সাধিত হয়নি। মোবাইল শুধু মাত্র বাক্য আদান প্রদানের উপকরণ হিসেবেই ব্যবহৃত হত। মোবাইল সেটগুলো ছিল অত্যন্ত সাদামাটা। মাল্টিমিডিয়া সেট তখন অভাবিত বিষয় ছিল। কিন্তু বর্তমানে মোবাইল প্রযুক্তি আকাশচুম্বী উৎকর্ষতা সাধন করেছে। কম্পিউটারের মত মোবাইলও এখন একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার। অত্যাধুনিক নানা প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ হয়ে নিত্য-নতুন মোবাইল বাজারে আসছে। সম্প্রতি ইন্টারনেট প্রযুক্তিও সংযুক্ত হয়েছে এ মোবাইলে। কম্পিউটার, টিভি, ভিসিডি-সবকিছুর কাজই করছে মোবাইল। ওসব কিনতে যে বড় অংকের টাকা লাগে সে তুলনায় মোবাইলের দাম একেবারে হাতের নাগালে। তাই মিডিয়া আগ্রাসনের সুলভ এক আখড়ায় পরিণত হয়েছে মোবাইল।
বর্তমানে মোবাইল নিয়ে যত গবেষণা চলছে সবক্ষেত্রেই ফলাফল হল, মোবাইল প্রযুক্তিটি যত না উপকারের তার চেয়ে বেশি অপকারের। বিশেষ করে বাংলাদেশের মত একটি মুসলিম রাষ্ট্রের জন্য এটি একটি ভয়াবহ ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। তারুন্যের আবেগকে পুঁজি করে ব্যবসায়ীগণ মোবাইল নিয়ে ব্যাপকহারে শুধু ব্যবসাই করে যাচ্ছে। কিন্তু এই মোবাইল প্রযুক্তি সামাজিক অবকাঠামো, শালীনতা, ভদ্রতা, বিশেষ করে মুসলমানদের আধ্যাত্মিকতা এবং নীতি আদর্শের নৈপুণ্যকে কিরূপে ধ্বংস করে দিয়ে যাচ্ছে এর খবর রাখার কেউ গরজই করছে না। বরং এর দ্বারা সামাজিক, পারিবারিক, রাষ্ট্রীয় ও পরিবেশগত ক্ষতিতো হচ্ছেই, তদুপরী মানুষের স্বাস্থ্যগত ক্ষতির ফিরিস্তিও কম ভয়াবহ নয়।

মোবাইল প্রযুক্তি থেকে যা পেলামঃ
যোগাযোগের ক্ষেত্রে অকল্পনীয় উন্নতি ও অভূতপূর্ব অগ্রগতি আনয়নই মোবাইলের সবচে' বড় অবদান। যে তথ্যের জন্য দীর্ঘ অপেক্ষা, লম্বা সফর, অধিক শ্রম ও অর্থ ব্যয় করতে হতো, মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই দু' চার টাকা খরচ করে আজ তা অর্জন সম্ভব হচ্ছে। হাজার মাইলের দূরত্ব মুহূর্তে ঘুচিয়ে দিচ্ছে এ মোবাইল। মোবাইলে ইন্টারনেট সেবা যোগ হওয়ায় এর কার্যকারিতা ও সেবার পরিধিও বিস্তৃত হয়েছে বহুগুণে। ইন্টারনেটের যাবতীয় সেবা পাওয়া যাচ্ছে এখন মোবাইলে। এই

হল মোবাইলের সর্ববৃহৎ অবদান। মোবাইলের অবদান যদি এ পর্যন্তই সীমিত থাকতো, তবে তা নিয়ে খুব একটা সতর্কতা বা সাবধানতার কথা আসত না। সত্যি বলতে কি, দুষ্টের দমনে যেমন, লালনেও তেমন ব্যবহৃত হচ্ছে আজ এ আধুনিক প্রযুক্তি। আজ এই মোবাইল নামক ক্ষুদে যন্ত্রটি সুকর্মে-অপকর্মে, মন্দ রোধে-বিস্তারে প্রতিযোগী অবদান রেখে চলেছে। এছাড়াও মোবাইল রেডিয়েশনের স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি-আরো সুদীর্ঘ কাহিনী। প্রথমে মোবাইলের স্বাস্থ্যগত ক্ষতি সম্পর্কে পৃথিবীর বিভিন্ন গবেষণার অংশবিশেষ তুলে ধরা হবে, এর পর সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় ক্ষতির বিবরণ তুলে ধরতে চেষ্টা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

মোবাইল ফোন স্বাস্থ্যের জন্য 'টাইম বোমা'!

মোবাইল ফোনকে স্বাস্থ্যের জন্য 'টাইম বোমা'র সঙ্গে তুলনা করেছেন বিজ্ঞানীরা। একই সঙ্গে প্রযুক্তির এই গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গের নিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের জন্য জনসাধারণকে সতর্ক করার ব্যাপারে বিভিন্ন দেশের সরকারকে আহ্বান জানিয়েছেন তাঁরা।

সম্প্রতি প্রায় ২০০টি গবেষণায় মোবাইল ফোনকে মস্তিষ্কের টিউমার ও ক্যানসারের অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। যুক্তরাজ্যের শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞানীরা এই গবেষণাগুলোতে নেতৃত্ব দিয়েছেন। ডেইলি মেইলে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিজ্ঞানীরা এক প্রতিবেদনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকারের সমালোচনা করে বলেছেন, সরকারগুলো এই ভয়াবহ স্বাস্থ্যসমস্যার ব্যাপারে কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না। তাঁরা বলেন, মোবাইল ফোনের কারণে সবচেয়ে বড় স্বাস্থ্যঝুঁকিতে আছে শিশুরা।

গবেষণার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সিগারেটের মোড়কে যেমন স্বাস্থ্যসমস্যার কথা লেখা থাকে, ঠিক তেমনি মোবাইল ফোনের গায়ে কিংবা দোকানে 'মোবাইল ব্যবহার স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ' এ ধরনের স্লোগান লেখা শুরু করা উচিত।

এদিকে মোবাইল প্রযুক্তির সঙ্গে জড়িত বিশেষজ্ঞরা এই গবেষণার সমালোচনা করে বলেছেন, 'এই গবেষণাটি অসম্পূর্ণ। মোবাইল ফোন গিলোমা নামের বিরল একটি মস্তিষ্ক টিউমারের জন্য দায়ী। তবে সেই টিউমার সাধারণত খুব অল্প মানুষের হয়।' এই টিউমারের জন্য মোবাইল ফোনকে ঢালাও দোষারোপ করার সমালোচনাও করেছেন তাঁরা। তাঁরা বলেন, এসব অসম্পূর্ণ গবেষণার তথ্য দিয়ে কিছু বিজ্ঞানী মানুষের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করছেন।

২০০৮ সালে সুইডেনে হওয়া এক গবেষণায় জানা গেছে, যে শিশুরা মোবাইল ফোন ব্যবহার করে, তাদের শরীর অন্যান্য শিশুর চেয়ে পাঁচ শতাংশ কম হারে বৃদ্ধি পায়। তবে এসব গবেষণা প্রতিবেদনের সপক্ষে জোরালো কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

এ ছাড়া কয়েকটি গবেষণায় দেখা গেছে, গর্ভাবস্থায় কোনো মা অতিরিক্ত মোবাইল ব্যবহার করলে তিনি অপরিণত শিশুর জন্ম দিতে পারেন। গত বছরের (২০১১ইং) জুন মাসে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা স্বীকার করেছে যে মোবাইল ফোন মস্তিষ্কের টিউমার, ক্যানসারসহ নানাবিধ রোগের কারণ হতে পারে।

ডেইলি মেইলে প্রকাশিত প্রতিবেদনে আরও বলা হয়,'বিশ্বের বহু মানুষ মোবাইল ফোন ব্যবহার করছেন, তারা জানেন না এই মোবাইল ফোনের অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে শুধুমাত্র ব্রেইন টিউমারই নয়, সন্তান জন্মদানেও সমস্যা তৈরি হতে পারে'। যুক্তরাজ্যে সরকার স্বাস্থ্যঝুঁকির কথা বিবেচনা করে ১৬ বছরের কম বয়সীদের জন্য মোবাইল ফোনের ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

মোবাইল ফোন রেডিয়েশনের ক্ষতি সম্পর্কে আরেকটি গবেষণা

মোবাইল ফোনের রেডিয়েশনে স্বাস্থ্য ঝুঁকিঃ

মোবাইল ফোন ব্যবহারের সময় বার্তা আদান প্রদানের সময় ফোন থেকে নির্গত তেজস্ক্রিয় রশ্মির বা রেডিয়েশনের (Radiation) প্রভাবে মানব দেহের ক্ষতি হয়ে থাকে। সবাই কানে অর্থাৎ মাথার পাশে ফোন ধরে কথা বলে। কথা বলার সময় মোবাইল থেকে নির্গত রেডিয়েশন মস্তিষ্কের কোষগুলোর সংস্পর্শে চলে আসে। ফলে মস্তিষ্ক তথা দেহের অন্যান্য অংশেও প্রভাব পড়ে ও নানা ধরনের স্বাস্থ্য ঝুকির সৃষ্টি হতে পারে।

মোবাইলের রেডিয়েশন কিভাবে কাজ করে?

মৌলিক কিছু কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করার প্রয়োজনে প্রতিটি মোবাইল ফোনকেই কিছু পরিমাণে বিদ্যুৎচৌম্বকীয় তেজস্ক্রিয়তা তথা ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন(Electromagnetic Radiation) নির্গত হয়। মোবাইল ফোন রেডিও ওয়েভ বা বেতার তরঙ্গের মাধ্যমে সিগনাল প্রেরণ করে। এই রেডিও ওয়েভে আছে রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি এনার্জি, যা আসলে এক ধরনের বিদ্যুৎচৌম্বকিয় তেজস্ক্রিয়তা।

রেডিয়েশন বা তেজস্ক্রিয়তার উৎসঃ

আমরা যখন মোবাইল ফোনে কথা বলি তখন ফোনের ট্রান্সমিটারটি আমাদের মুখ থেকে নির্গত শব্দকে গ্রহণ করে সেটিকে ধারাবাহিক সাইন ওয়েভে সংকেতায়িত করে। সাইন ওয়েভ হচ্ছে একধরনের অনির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট তরঙ্গ যেটি ফোনের এন্টেনা থেকে নির্গত হয়ে ইথরে প্রবাহিত হয়। সাইন ওয়েভকে মাপা হয় ফ্রিকোয়েন্সি দিয়ে। ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে একটি তরঙ্গ কত বার উঠা নামা

করে তারই হিসাব। আমাদের মুখ থেকে নিঃসৃত শব্দকে সাইন ওয়েভে রাখা হয়, তখনই ট্রান্সমিটার ঐ সিগনাল বা সঙ্কেতকে এন্টেনার কাছে প্রেরণ করে, এন্টেনা আবার এই সিগনালকে অন্য প্রান্তে পাঠিয়ে দেয়।

রেডিয়েশন বা তেজস্ক্রিয়তার কিছু কথাঃ

মোবাইল ফোনের মধ্যে যে ট্রান্সমিটার থাকে সেগুলো শক্তির দিক থেকে কম বেশী হয়ে থাকে। সেলফোন ০.৭৫ থেকে ১ ওয়াট শক্তিতেই দিব্যি চলতে পারে। ফোনের নির্মাতাভেদে এর ভেতরে ট্রান্সমিটারের অবস্থান ভিন্ন ভিন্ন স্থানে হতে পারে; তবে সাধারনত এটি ফোনের এন্টেনার খুব কাছাকাছি থাকে।

সংকেতায়িত সিগনালকে প্রেরণ করার দায়িত্ব যে বেতার তরঙ্গের, সে তরঙ্গ গঠিত হয় এন্টেনা থেকে নির্গত বিদ্যুৎচৌম্বকীয় তেজস্ক্রিয়তা বা ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন দিয়ে। এন্টেনার কাজ হচ্ছে বেতার তরঙ্গকে শূন্যে ছড়িয়ে দেওয়া। মোবাইল ফোনের ক্ষেত্রে এসব তরঙ্গকে গ্রহণ করা বা রিসিভ করার দায়িত্ব হচ্ছে মোবাইল ফোনের টাওয়ারে স্থাপিত একটি রিসিভারের।

বিদ্যুৎচৌম্বকীয় তেজস্ক্রিয়তাতে কি আছে ?

বিদ্যুৎচৌম্বকীয় তেজস্ক্রিয়তাতে আছে বৈদ্যুতিক ও চৌম্বকীয় শক্তির তরঙ্গ যা চলাফেরা করে আলোর গতিতে। সকল বিদ্যুৎচৌম্বকীয় শক্তিই Electromagnetic Spectrum এর রেঞ্জ বা পরিধির মধ্যে অবস্থান করে। এই রেঞ্জের মধ্যে কম শক্তির ফ্রিকোয়েন্সির শক্তি যেমন আছে তেমন আছে এক্সরে এবং গামারের মত শক্তিশালী ফ্রিকোয়েন্সি।

বিদ্যুৎচৌম্বকীয় তেজস্ক্রিয়তার ধরনঃ

বিদ্যুৎচৌম্বকীয় তেজস্ক্রিয়তা বা ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন দুই ধরনের হতে পারে। যথাঃ

১.আয়োনাইজিং রেডিয়েশন (Ionizing Radiation)

২.নন- আয়োনাইজিং রেডিয়েশন (Non-Ionizing Radiation)

১.আয়োনাইজিং রেডিয়েশনঃ

এ রেডিয়েশনে এমন মাত্রায় বিদ্যুৎচৌম্বকীয় শক্তি আছে যা থেকে অনু-পরমাণুকে বিচ্ছিন্ন করতে এবং মানবদেহের রাসায়নিক বিক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে। আয়োনাইজিং রেডিয়েশন এর উদাহরন হচ্ছে এক্সরে এবং গামারে।

২. নন- আয়োনাইজিং রেডিয়েশনঃ

এই রেডিয়েশনকে নিরাপদ বা অ-ক্ষতিকারক বলা যায়। এ থেকে উষ্ণতার সৃষ্টি হয় বটে, তবে তা দেহকোষের দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতি করার মত কিছু নয়। রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি শক্তি, দৃশ্যমান আলো এবং মাইক্রোওয়েভ রেডিয়েশনকে নন-আয়োনাইজিং রেডিয়েশন হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

মোবাইল ফোনে স্বাস্থ্য ঝুঁকি নিয়ে পক্ষ বিপক্ষ মত ঃ

যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ফুড অ্যান্ড ড্রাগ এডমিনিস্ট্রেশন (FDA) নানা ভাবে গবেষণা করার পর ঘোষণা করে 'মোবাইল ফোন থেকে স্বাস্থ্যঝুঁকি হতে পারে এর তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায় নি।' এর মানে এই না যে মোবাইল ফোন থেকে স্বাস্থ্যহানি বা শারীরিক ক্ষতির সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। অতিমাত্রায় রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি রেডিয়েশনের কারণে মানব দেহের কোষ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এতে কোন সন্দেহ নেই। মাইক্রোওয়েভ ওভেন যেমন খাবারকে গরম করে ঠিক একইভাবে রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি রেডিয়েশন মানুষের দেহকোষকে উত্তপ্ত করে। কারণ মানুষের দেহ অতিমাত্রায় উত্তাপ সহ্য করার মত করে তৈরি হয়নি। বিশেষ করে রক্ত প্রবাহের স্বল্পতার কারণে আমাদের চোখ ও এর আশেপাশের এলাকা এই উত্তাপ থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

মোবাইল ফোন আয়োনাইজিং রেডিয়েশন ও নন- আয়োনাইজিং রেডিয়েশন দুই ধরনেরই হতে পারে। আয়োনাইজিং রেডিয়েশন এর চেয়ে নন- আয়োনাইজিং রেডিয়েশনে ক্ষতির মাত্রা অনেক কম হলেও দীর্ঘ দিন ধরে এই রেডিয়েশন ঘটলে কি হয় বলা মুশকিল। অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন, একনাগাড়ে অনেক দিন এই রেডিয়েশন ব্যবহারের কারণে মানব দেহের উপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়তে পারে। মানুষ বর্তমানে যে হারে মোবাইল ফোন ব্যবহার করছে তাতে স্বাস্থ্যহানি হওয়াটা স্বাভাবিক।

মোবাইল রেডিয়েশনের সম্ভাব্য রোগসমূহঃ

* ক্যান্সার (Cancer)
* ব্রেইন টিউমার (Brain tumor)
* আলঝেইমার'স (Alzheimer's)
* পারকিনসন'স (Parkinson's)
* ক্লান্তি (Fatigue)
* মাথা ব্যথা (Headaches)

মোবাইল ফোনের সঙ্গে জড়িত যত রোগের কথা এ পর্যন্ত উঠেছে তার মধ্যে ক্যান্সার ও ব্রেইন টিউমারই প্রধান। তবে এ ব্যাপারে অনেক গবেষণা চালিয়েও গবেষকরা এ পর্যন্ত কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেনি।

বিভিন্ন গবেষণাঃ

ডেনমার্কের এক দল বিজ্ঞানী প্রায় ২০ বছর ধরে ৪ লক্ষ ২০ হাজার ডেনিশ নাগরিকের উপর গবেষণা চালানোর পর ২০০৬ সালে তারা ফল প্রকাশ করে। তাদের গবেষণায় মোবাইল ফোন ও ক্যান্সারের কোন সম্পর্ক পাওয়া যায়নি। আমরা জানি যে মোবাইল ফোন দেশ ও মহাদেশ ভিত্তিক তৈরি হয়। তার মধ্যে ধরা হয়

ইউরোপ মহাদেশের জন্য যে মোবাইল ফোন গুলো তৈরি হয় তার গুনাগুন সবচেয়ে ভালো। তাই ডেনমার্কের গবেষকদের তথ্য সকলের জন্য নির্ভরযোগ্য নয়।
সুইডেনের ক্যারিলিওনস্কা ইনস্টিটিউট- এর গবেষকরা মোবাইল ফোনের সঙ্গে ব্রেইন টিউমারের সম্পর্ক আছে কিনা তা নিয়ে গবেষণা চালান। গবেষণা শেষে তারা মন্তব্য করেন দশ বছর বা তার বেশি সময় রীতিমত মোবাইল ব্যবহার করলে Acoustic Neuroma নামক ব্রেইন টিউমারের আশঙ্কা দেখা দিতে পারে। তবে ১০ বছরের কম সময় মোবাইল ব্যবহারকারীদের মধ্যে এই টিউমার হবার কোন লক্ষন দেখা দেয়নি।
২০০৭ সালে Dr. Lenart Hardel নামক এক সুইডিশ গবেষক তার গবেষণা রিপোর্টে বলেন, অতিরিক্ত মোবাইল ব্যবহারকারীদের মধ্যে ক্ষতিকর তথা Malignant Tumor হবার আশঙ্কা বেশি থাকে। এছাড়াও মানুষ মাথার যে পাশে ফোন ধরে কথা বলে সেপাশে টিউমার হবার সম্ভাবনা বেশি থাকে বলে জানান Dr. Hardel . শুধু তাই নয় টানা ১০ বছর ধরে প্রতিদিন এক ঘণ্টার বেশি মোবাইল ফোন ব্যবহার করলে টিউমারের আশঙ্কা অনেক বেড়ে যায় বলে অভিমত দেন তিনি।
এখনও বিভিন্ন দেশে এই নিয়ে গবেষণা চলছে।
সূত্রঃ www.moumachibd.com
মোট কথা হল মোবাইল নিয়ে গবেষণায় অনেক মতভেদ রয়েছে, তার মধ্যে মোবাইল ব্যবহারে ক্ষতি হবার সম্ভাবনা আছে বলে বেশীর ভাগ গবেষকদের ধারনা। (এখানে স্মর্তব্য বিষয় যে, গবেষকদের পক্ষ থেকে ক্ষতি হওয়ার বিষয়টি জোরালোভাবে প্রচার করা মুশকিল) কিন্তু উন্নত বিশ্ব মোবাইলের ক্ষতি থেকে নিরাপত্তার জন্য যেসকল পরামর্শ তাদের নাগরিকদের দিয়ে থাকেন তা থেকেই অনুমান করা যায় মোবাইল বাস্তবিক স্বাস্থ্যের জন্য বড় ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ। যেমন অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স, জার্মানি এবং সুইডেন ইত্যাদি দেশের তেজস্ক্রিয়তা সংক্রান্ত জাতীয় উপদেষ্টা কর্তৃপক্ষ মোবাইল ফোনের রেডিয়েশন থেকে নিরাপদ থাকার জন্য তাদের নাগরিকদের কিছু পরামর্শ দিয়ে থাকেন। এর মধ্যে রয়েছে ঃ
* হ্যান্ডস-ফ্রি মোবাইল ব্যবহার করতে হবে।
* মোবাইল ফোনকে যতটা সম্ভব শরীর থেকে দূরে রাখতে হবে।
* এক্সটারনাল এন্টেনা ছাড়া গাড়িতে মোবাইল ব্যবহার করা উচিত নয়।
* ঘুমানোর সময় মোবাইল মাথা থেকে দূরে রাখতে হবে।
* এক টানা দীর্ঘ সময় মোবাইলে কথা বলা উচিত নয়।
* বিল্ডিং এর ভিতরে যথা সম্ভব ফোনে কথা না বলা।
* যত টুকু সম্ভব বাইরে বসে ফোনে কথা বলা ভালো।
* মোবাইল যতটা সম্ভব শিশুদের থেকে দূরে রাখা উত্তম।

মোবাইল ফোনের কারণে প্রজনন ক্ষমতা কমে যায় !

সম্প্রতি মার্কিন গবেষকরা জানিয়েছেন, মোবাইল ফোন ব্যবহারে পুরুষের প্রজনন ক্ষমতা কমে যায়। মোবাইল চালু করে প্যান্টের পকেটে রাখলে পুরুষের শুক্রাণুতে বড়ো ধরনের প্রভাব ফেলে এবং তা ক্রমে প্রায় অর্ধেক হয়ে যায়। খবর টাইমস অফ ইন্ডিয়ার।
সংবাদমাধ্যমটির বরাতে জানা গেছে, মোবাইল ফোন ব্যবহারে প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস পায় এ বিষয়টি নিয়ে সম্প্রতি সাতটি দেশে গবেষণা চালিয়েছেন গবেষকরা। আমেরিকা, চীন এবং অস্ট্রেলিয়ার গবেষকরা জানিয়েছেন, চালু থাকা মোবাইল ফোন প্যান্টের পকেটে রাখলে তা শুক্রানু তৈরির পরিমাণ কমিয়ে দেয়। নোবেল জয়ী মার্কিন গবেষক ডেভরা ডেভিস জানিয়েছেন, 'বাবা হতে চাচ্ছেন এমন যুবকদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, চার ঘন্টা মোবাইল ফোন ব্যবহার করলে তার শুক্রানু অর্ধেক হয়ে যায়।
তিনি আরো জানিয়েছেন, শুক্রানুর উপর মোবাইল ফোনের বিকিরণ প্রয়োগ করলে শুক্রানু দুর্বল, চিকন এবং সাঁতারে অক্ষম হয়ে পড়ে। আর মোবাইল ফোন হলো এক ধরনের স্বল্প কম্পাঙ্কের তরঙ্গ প্রেরক যন্ত্র। এ তরঙ্গের অন্য নাম মাইক্রোওয়েভ।
জানা গেছে, ডেভিস তার 'ডিসকানেক্ট: দ্যা ট্রুথ অ্যাবাউট সেল ফোন রেডিয়েশন, হোয়াট দ্যা ইন্ডাস্ট্রি হ্যাজ ডান টু হাইড ইট এন্ড হাউ টু প্রটেক্ট ইওর ফ্যামিলি' নামের বইটিতে এসব তথ্য জানিয়েছেন।
ডেভিস মোবাইল ফোন ব্যবহার বিষয়ে সতর্ক করে জানিয়েছেন, মোবাইল ফোনের এই বিকিরণ অনেক দীর্ঘ মেয়াদী সমস্যার সৃষ্টি করবে। একটানা মোবাইল ফোন ব্যবহার স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।
অন্যদিকে, ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদল জানিয়েছেন, মোবাইল ফোনের ব্যবহার মারাত্মক টিউমারের সৃষ্টি করে।
সূত্র : বিডিনিউজটোয়েন্টিফোরডটকম
মোবাইলের বিভিন্ন ক্ষতিকর দিকগুলো বিভিন্ন দেশের মোবাইল কোম্পানী কর্তৃক, গোপন করার কথাও উঠেছে বিশ্বব্যাপী। একারণে বিভিন্ন স্বাস্থ্য সংস্থা, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা বক্তব্য দিয়েছেন। তারা বলেছেন, মোবাইলের ম্যানুয়ালে এমন ব্যবহার পদ্ধতি লিপিবদ্ধ

থাকতে হবে যাতে মোবাইলের স্বাস্থ্য ঝুঁকি থেকে মানুষ রক্ষা পায় এবং সচেতন হয়। এ ব্যাপারে একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে:

বৃটেনে মোবাইল সেটের ম্যানুয়ালে 'সতর্কবার্তা' যথাযথভাবে উল্লেখ করা হচ্ছে না ঃ

মোবাইল ফোন প্রস্তুতকারী কোম্পানিগুলোকে এই মর্মে অভিযুক্ত করা হয়েছে যে, হ্যান্ডসেট ব্যবহারে স্বাস্থ্যগত যেসব ঝুঁকি রয়েছে, 'ব্যবহার নির্দেশিকা'য় তারা তা গোপন করছে।

দেখা গেছে, অ্যাপলের জনপ্রিয় আইফোন যে শরীর থেকে কমপক্ষে ১৫ মিলিমিটার দূরে রাখা উচিত- এ সতর্কবার্তাটি তারা তাদের ম্যানুয়ালের অনেক ভেতরে দিয়ে রেখেছে।

আবার ব্ল্যাকবেরি ইতোপূর্বে ভোক্তাসাধারণের উদ্দেশ্যে বলেছিল যে, তাদের হ্যান্ডসেটগুলোকে 'হ্যান্ডস ফ্রি' করে ব্যবহার করা উচিত এবং অন্যান্য সময় শরীর থেকে কমপক্ষে এক ইঞ্চি দূরে রাখা প্রয়োজন।

বিশেষ করে গর্ভবতী নারী এবং টিনেজারদের তলপেট থেকে মোবাইল ফোন দূরে রাখতে বিশেষভাবে সতর্ক করেছিল তারা।

কিন্তু এধরনের সতর্কবার্তা তারা তাদের 'ব্যবহার নির্দেশনা'য় একেবারেই চেপে গেছে। এছাড়াও নোকিয়া, এইচটিসিসহ হ্যান্ডসেট প্রস্তুতকারক অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলোও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সতর্কবার্তাগুলো তাদের ম্যানুয়ালে ব্যবহারের ক্ষেত্রে খুব ছোট ছোট হরফ ব্যবহার করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। আর এসব কারণেই হ্যান্ডসেট বক্সে স্পষ্ট করে সতর্কবার্তা লিখার দাবিতে স্বাস্থ্য প্রচারণাকারী এবং রাজনীতিকরা বিশ্বব্যাপী দাবি তুলেছেন।

মোবাইল ফোনগুলোর নিরাপত্তাব্যবস্থা নিয়ে তদন্ত করে এমন একটি স্বাধীন গ্রুপ 'পাওয়ারওয়াচ'র অ্যালাসডেইর ফিলিপস বলেন, 'অধিকাংশ ব্যবহারকারীরই এসব সতর্কতা সম্পর্কে কোনো জ্ঞান নেই। নিরাপত্তাসংক্রান্ত পরামর্শগুলো হ্যান্ডসেট বক্সের ওপর অথবা ব্যবহার-নির্দেশনার 'গেটিং স্টার্টেড' বিভাগে খুব স্পষ্ট করে সবিস্তারে লিখে দেয়া উচিত। এসব সতর্কবাণী এমন কোনো জায়গায় লেখা উচিত নয়, সাধারণত যা ব্যবহারকারীর নজর এড়িয়ে যায়। মোবাইল হ্যান্ডসেট ব্যবহারে যে ঝুঁকি রয়েছে সেব্যাপারে সচেতনতা বাড়াতে স্কুল পর্যায় থেকেই শিক্ষা দেয়া উচিত বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

উল্লেখ্য, হ্যান্ডসেটের ম্যানুয়ালগুলোতে যে নিরাপত্তা পরামর্শ থাকে, তা মূলত দেয়া হয়ে থাকে রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি এক্সপোজার কমানোর জন্যে। ক্ষতিকারক এই রশ্মি দেহের টিস্যু এবং আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গকে আক্রান্ত করে থাকে। ব্রেইন টিউমারের জন্যেও এই ক্ষতিকারক রশ্মি দায়ী হতে পারে বলে গবেষণায় দেখা গেছে। এই রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি এক্সপোজারের অধিকাংশই আসে মোবাইল সেটের এ্যান্টেনা থেকে। হ্যান্ডসেটকে যখন পকেটে রাখা হয় তখন এই রশ্মির নির্গমন বৃদ্ধি পেতে পারে; কারণ মোবাইলের নেটওয়ার্ক সিগন্যাল দুর্বল থাকাকালে মোবাইল ফোন তার বহির্গমণ শক্তি বাড়িয়ে দেয়।

লোকজন যখন তাদের হ্যান্ডসেটকে বেল্ট কিংবা পকেটে বয়ে বেড়ায়, তখন মোবাইল সেটের পেছন দিকটি যদি তাদের শরীরের চামড়ার দিকে লেগে থাকে তবে এর মাধ্যমে এ্যান্টেনা থেকে হায়ার এক্সপোজার বেশি পরিমাণে আক্রান্ত করতে পারে। দেখা যায়, মেয়েরা তাদের ভ্যানিটি ব্যাগে মোবাইল সেট ব্যাবহার করেন; যা তাদের ব্রেস্টের নিচে ঝুলানো থাকে। এরকম অবস্থায় মোবাইলের ক্ষতিকর রশ্মি নারীশরীরে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।

রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি এক্সপোজার গর্ভবতী নারীদেরও সমস্যা বয়ে আনতে পারে। একারণেই বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, গর্ভবতী নারীদের উচিত গর্ভধারণের প্রথম ছয় মাস মোবাইল হ্যান্ডসেটটিকে সবসময় তলপেট থেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখা।

এদিকে ব্রিটেনের গ্রিন পার্টির নেতা এবং এমপি ক্যারোলিন লুকাস বলেন, অন্যান্য প্রযুক্তির ক্ষতিকারক দিকের মতো মোবাইল ফোনের ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কেও জনগণকে সচেতন করতে হবে। সাথে সাথে এসবের সর্বোচ্চ নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিত করতে ব্যবহারকারীদের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করতে হবে।

সূত্র: http://ukbdnews.com/

আরেকটি প্রতিবেদনে মোবাইলকে "নিরব ঘাতক" বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তাতে বলা হয় :

নীরব ঘাতক মোবাইল ফোন ঃ

মোবাইল ফোনের দীর্ঘ ব্যবহারের ফলে ক্যান্সারের ঝুঁকি রয়েছে, কিছু গবেষকের এমন মত দিনে দিনে বেশ জোরালো হয়ে উঠছে।

গত গ্রীষ্মে ইউনিভার্সিটি অফ পিটাসবার্গ ক্যানসার ইনস্টিটিউট এর পরিচালক ড. রোনাল্ড হেবারম্যান হঠাৎই সংস্থাটির প্রায় ৩,০০০ কর্মকর্তা-কর্মচারীকে মোবাইল ফোনের ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন এর বিষয়ে সতর্ক করে

দেন। তিনি জানান, মোবাইল ফোন সেটে ক্ষতিকর ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন রয়েছে, আর তাই এই যন্ত্রটিকে শরীর থেকে যতদূরে রাখা যায় ততই মঙ্গল? শুধু তাই নয়, একান্ত জরুরি না হলে শিশুদেরকে মোবাইলের নাগালের বাইরে রাখারও পরামর্শ দেন তিনি। সম্প্রতি তিনি জানান, গত বছর আমি এই সতর্কতা জারি করেছিলাম, কারণ আমার বিশ্বাস এর ব্যবহারে ক্যান্সারের ঝুঁকি রয়েছে, বিশেষ করে শিশুদের।

লন্ডনভিত্তিক ডেইলি টেলিগ্রাফ সম্প্রতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক অপ্রকাশিত প্রতিবেদনের সূত্র ধরে জানিয়েছে, ১০ বছর বা তাঁর বেশী সময় ধরে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীদের ব্রেইন টিউমার হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। ১০ বছর ধরে চালিত অনুসন্ধানের প্রেক্ষিতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তৈরি এই প্রতিবেদন প্রকাশ হবে চলতি বছরের শেষ নাগাদ।

গবেষণা বলছে, মোবাইল ফোন কখনো ব্যবহার করেনি বা খুব কম ব্যবহার করেছে এমন মানুষের তুলনায় ১০ বছর বা তার বেশি সময় ধরে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীদের ব্রেইন টিউমার হওয়ার ঝুঁকি ১০ থেকে ৩০ শতাংশ বেশি।

যদিও কিছু দুর্বল গবেষণা উল্টো বলছে, মোবাইল ফোন ব্যবহারের ফলে ব্রেইন টিউমারের ঝুঁকি বরং কমে। তবে কেন কমে তার কোন সঠিক বিশ্লেষণ এসব গবেষণা থেকে মেলেনি। বরং বিভিন্ন মোবাইল কোম্পানির অর্থায়নে করা এসব গবেষণার নির্ভরযোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে।

অনেকেই মনে করতে পারেন, মোবাইল ফোন নয় বরং ব্লুটুথ কানের সঙ্গে রেখে কথা বললে বুঝি ক্ষতি হবে না। তাদেরকে জানাচ্ছি, ব্লুটুথ সারাদিন কানের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখলে তা মোবাইল এর মতোই ক্ষতিকর হতে পারে।

তাহলে সমাধান কি? গবেষকদের মতে, এমন মোবাইল ফোন বাজারে ছাড়া উচিত যা হেডফোন ছাড়া ব্যবহার করা যাবেনা। সেক্ষেত্রে ব্যবহারকারীরা মোবাইল সেটটিকে শরীর থেকে খানিকটা দূরে রাখতে পারবে।

সূত্র : http://www.dw.de/dw/article

বাস্তবতার নিরিখে মোবাইলের স্বাস্থ্যগত ক্ষতিঃ

বাংলাদেশে মোবাইলের ব্যাপক বিস্তার আরম্ভ হয়েছে খুবই নিকট অতীতে। ৭/৮বছর বা এক দু'বছর বেশি হয়ত হবে। কিন্তু এই সময়টুকুতে দেশের সকল মানুষের সর্ব দিক দিয়ে বিবর্তন এসেছে কল্পনাতীতভাবে। স্বাস্থ্যের কথাই বলি। এই ক'বছর আকস্মিকভাবেই দেশে কয়েকটি রোগের হার বৃদ্ধি পেয়েছে প্রচণ্ডভাবে। যেমন ব্রেইন ক্যান্সার, বক্ষব্যাধী, কোমরে ব্যথা, চোখের রোগ, কানের রোগ এবং কিডনি রোগ ইত্যাদি। এর জন্য শুধু মোবাইলকেই দায়ী করছি তা নয়। বরং এসব রোগের ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও মোবাইলের ক্ষতিকর উপকরণ সংশ্লিষ্ট রয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ দেশের বড় বড় ডাক্তারগণ এসকল রোগ নিয়ে তাদের শরনাপন্ন হলে অন্যান্য বস্তুর সাথে মোবাইল ব্যবহারেও সংযত হওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। তাতে বুঝা যায় এসব ক্ষেত্রে মোবাইলের ক্ষতিকর দিকও রয়েছে। এছাড়াও শুধু মোবাইলের কারণে রোগ হচ্ছে তা প্রমাণ করতে হলে ঐ সকল ব্যক্তিকে উপস্থাপন করা যায়, যাদের মোবাইল ব্যবহারের মেয়াদ দশ বছর পুরোইনি অথচ কানে লাগিয়ে এখন আর মোবইলে কথা বলতে পারেন না তারা। সেরূপ লোকের সংখ্যাও এখন কম নয়। আবার অনেকে আছে পাঞ্জাবীর পকেটে বা প্যান্টের পকেটে মোবাইল রাখতে পারেন না। মোবাইল রাখলে তাদের কোমর, রান, বা কিডনিতে ব্যথা অনুভব হয়। এরূপ বহু রোগীও বাংলাদেশে আছে। সুতরাং মোবাইল যে, স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর তার জন্য আমাদের আর দূরে যেতে হচ্ছে না। বরং সাত আট বছরের অভিজ্ঞতাই আমাদের জন্য যথেষ্ট।

এ দীর্ঘ লেখায় প্রমাণিত হলো যে, মোবাইল মানব দেহের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর এবং ঝুঁকিপূর্ণ। এই ঝুঁকি থেকে নিরাপদ থাকার জন্য বিভিন্ন দেশ ও বিভিন্ন কোম্পানী বহুবিদ পরামর্শ দিলেও মুসলমানদের বেলায় শরীয়তের দৃষ্টিতে এর উপকারিতা ও অপকারিতা উভয়টি যাচাই করে মোবাইল ব্যবহারের পরিধি ঠিক করে নেয়া উচিৎ।

এই বক্তব্যে যে সকল সতর্কতা ও সাবধানতার কথা বলা হয়েছে তা উন্নত বিশ্বের দেশগুলোতে যে মোবাইল সেট ব্যবহৃত হয় সেগুলো সম্পর্কে। কিন্তু বাংলাদেশের মত গরীব দেশগুলোতে যে সেটগুলো আসে সে সংক্রান্ত নিরাপত্তার বিষয়টি এদেশের গবেষকদেরই করা উচিৎ। কারণ সাধারণতঃ এদেশে যে হ্যান্ড সেট আসে তা উন্নত বিশ্বের জন্য তৈরী সেটগুলোর তুলনায় অনেক নিম্নমানের। এই সেটগুলো ততবেশী অনিরাপদ হওয়াটাই স্বাভাবিক। সুতরাং এদেশের মোবাইল সেট ও মোবাইল ব্যবহার সংক্রান্ত কঠোর একটি নীতিমালা আবশ্যক। এ তো গেল মোবাইলের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ক্ষতি।

আত্মশুদ্ধির জন্য আল্লাহ ওয়ালাদের কাছেই যেতে হবে

মাওলানা হাবীবুল্লাহ

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণের উদ্দেশ্যের মধ্যে উম্মতের আত্মশুদ্ধি অন্যতম উদ্দেশ্য। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে:

هو الذى بعث فى الاميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفى ضلال مبين

তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তার আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত। ইতিপূর্বে তারা ছিল ঘোর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত।
(সুরা জুমু'আহ - আয়াত, ২)

তাযকিয়া বলা হয় অন্তরের পবিত্রতাকে। অর্থাৎ মানুষের চিন্তা চেতনাকে নির্লজ্জতা আর দুনিয়াবি লোভ লালসা থেকে পবিত্র করে তাতে আখেরাতের ভয় আর আল্লাহর মুহাব্বাত সৃষ্টি করে দেওয়া। সাধারণত মানুষের মনের আকর্ষণ সেই সব বস্তুর প্রতি বেশি থাকে যেগুলো শরিয়তে নিষিদ্ধ, আর যেসব বিষয়ে নফস মজা পাই। সেরূপ বস্তু ও বিষয় থেকে
মানুষের অন্তরের মোড় ঘুরিয়ে,
হেদায়েত আর নেকীর দিকে নিয়ে আসার মেহনতকেই বলা হয় তাছাউফ বা ছুলুক বা তাযকিয়ায়ে নফস।

শরিয়তে তাযকিয়ায়ে নফছের গুরুত্ব অত্যাধিক। কারণ মানুষের অন্তর আর চিন্তা চেতনা যদি পবিত্র হয়ে যায় তাহলে গোটা সমাজ আর পরিবেশ ভাল না হওয়ার কোনও কারণ থাকতে পারেনা। মানুষের অন্তরে যখন আখেরাতের ইয়াকীন আর আল্লাহর ভয় থাকেনা তখন মানুষ চুরি, ডাকাতি, মাদক সেবন, জোর জুলুমসহ বিভিন্ন প্রকারের অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। আল্লাহর ভয় আর আখেরাতের ইয়াকীন বড় বড় গুনাহে অভ্যস্ত
মানুষকে পর্যন্ত হাতে অদৃশ্য হাত কড়া আর পায়ে অদৃশ্য ডাণ্ডা বেড়ি পরিয়ে দেয়। তখন সে এভাবে শুধরে যায় যে রাতের অন্ধকারেও তার মন কোনও অপরাধের দিকে ধাবিত হয় না, পরের সম্পদের প্রতি তার লোভ হয়না, পাপের উপকরণ থাকা সত্ত্বেও সেদিকে তার খেয়াল যায়না। একারণে পবিত্র কোরানে তাযকিয়ায়ে নফসের ব্যাপারে খুব গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

قد افلح من تزكى নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে সে, যে শুদ্ধ হয়। (সুরা আ'লা-আয়াত ১৪)

قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها

যে নিজেকে শুদ্ধ করে, সেই সফলকাম হয়। এবং যে নিজেকে কলুষিত করে, সে ব্যর্থ মনোরথ হয়। (সুরা-আশ-শামস= আয়াত ৯,১০)

এই দুটি আয়াতের দিকে দৃষ্টি দিলে বুঝা যায় কল্যাণ আর সফলতা তাযকিয়ায়ে নফসের সাথে সম্পৃক্ত। দিল বা অন্তর পাক পবিত্র থাকলেই নেক কাজ করা যায় । যাতে নিহিত রয়েছে পার্থিব ইজ্জত, মানসিক প্রশান্তি আর পরকালীন নেয়ামত, তথা জান্নাতের চিরস্থায়ী জীবন, সর্বোপরি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আগমনকালে আরব জাতি ছিল যুদ্ধংদেহী, অসভ্য,এবং অসৎ কাজে অভ্যস্ত। আল্লাহ তা'আলার মারেফাতের ধারে কাছেও ছিলনা তারা। স্বভাব চরিত্র ছিল একগুঁয়ে প্রকৃতির। কিন্তু নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহচর্যে এসে তারা এতই বদলে গেলেন যে,
সারা দুনিয়ার জন্য হেদায়েতের আলোকবর্তিকায় রূপান্তরিত হলেন। যারা সভ্যতা থেকে অনেক দূরে ছিল তারাই সভ্য এবং সর্বোৎকৃষ্ট সভ্য হয়ে গেলেন। যারা অসংখ্য দেব দেবীর পূজারি ছিল তারা এক আল্লাহর এবাদতকারী হয়ে গেলো। যারা একগুঁয়ে ছিল তাদের স্বভাব নম্র থেকে নম্রতর হয়ে গেল। যারা অখ্যাত ছিল তারা গোটা দুনিয়ার জন্য ইমাম হয়ে গেল।

হযরত আবু বকর রা., ছিদ্দিকে আকবর হয়ে গেলেন, ওমর রা., ফারুকে আজম হয়ে গেলেন, ওসমান গনী রা. জুন্নুরাইন হয়ে গেলেন, আলী রা., শেরে খোদা হয়ে গেলেন একমাত্র রসুলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহচর্যের বদৌলতে। হযরত বেলাল রা. আরবের বাইরের ছিলেন। গোলাম ছিলেন, কেউ চিনতো না তাঁকে, হযরত ছালমান ফারসি রা. ও আরবের বাইরের ছিলেন, অখ্যাত ছিলেন। কিন্তু রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহচর্যের বদৌলতে তাদের মর্যাদা এতই বৃদ্ধি পেল যে তারা মুসলমানদের সরদার হয়ে গেলেন।

রাসুলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরে সাহাবী, তাবেঈন, তবে তাবেঈন, তার পরে আওলিয়া ও বুজুর্গানে দ্বীনের সাহচর্যে এমন প্রভাব থাকে যে কঠিন থেকে কঠিন পাথর হৃদয় পর্যন্ত মোমের মত গলে যেতে পারে। অন্তরে আল্লাহর ভয় আর আখেরাতের আগ্রহ সৃষ্টি হতে পারে।

মানুষের মধ্যে সাধারণত অহংকার, হিংসা, পার্থিব লোভ-লালসা, আখেরাত সম্পর্কে উদাসীনতা, গুনাহের প্রতি তীব্র আগ্রহ ইত্যাদি থাকে। এই সমস্ত দোষ শয়তানের ওয়াসওয়াসা আর কুমন্ত্রণার দ্বারা বৃদ্ধি পেতে থাকে। আল্লাহর নেক বান্দাগণ রিয়াজাত আর মুজাহাদার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি করেছেন তাই তারা শয়তানের এসমস্ত ধোঁকা সম্পর্কে সহজে অবগত হন। তাই সহজে শয়তানের প্রতারনা থেকে বাঁচতে পারেন। আর যারা তাদের সংস্পর্শে আসেন এবং তাদের কাছ থেকে শয়তান আর নফসের ধোঁকা থেকে বাচার বিভিন্ন তদবীর শিখেন তারাও শয়তানের ধোঁকা সম্পর্কে সহজে অবগত হন আর সহজে বাঁচতে পারেন। আল্লাহর নেক বান্দাগণের প্রদর্শিত পথে চলার কারণে নফসের

বিভিন্ন দোষ ক্রমান্বয়ে ত্যাগ করা সহজ হয়ে যায়।

বুজুর্গানে দ্বীনের সাহচর্যে এসে মানুষ নফসের দোষ ত্রুটি গুলো সহজে ত্যাগ করে তার স্থলে আল্লাহর ভয়, আল্লাহর মা'রেফাত, আখেরাতের প্রতি মনোযোগী হওয়া ইত্যাদি ভাল গুনে গুণান্বিত হতে পারে। তখন সে যেখানেই থাকেনা কেন সব সময় আল্লাহর ভয় তার অন্তরে জাগ্রত থাকে। এটাকেই সুফিয়ায়ে কেরামের পরিভাষায় তাসাউফ আর সুলুক বলে।

তাসাউফ, সুলুক আর তাযকিয়ায়ে নফস সব একই জিনিষ। যখন অন্তর পবিত্র হয়ে যাবে তখন আল্লাহ তা'আলার প্রতি অন্তরের আকর্ষণ-বিকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ করা অন্তরের শুদ্ধতার উপর নির্ভরশীল। শায়খুল হাদিস আল্লামা জাকারিয়া রহ. এর নিকট একজন জিজ্ঞাসা করলেন তাসাউফ কি? তখন তিনি বললেন তাসাউফের শুরু " انما الاعمال بالنيات .. "নিশ্চয় আমলের গ্রহণযোগ্যতা নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল" আর শেষ ان تعبد الله كانك تراه "আল্লাহর ইবাদত এইভাবে কর যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ", এর উপর।

দৃশ্যত এখানে শুধু দুটি বাক্য। কিন্তু তাসাউফের মুল বিষয় এখানে বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ মানুষ যতই আমল করুক না কেন, যদি নিয়্যত শুদ্ধ নাহয় তাহলে কোনও আমলই ফায়দা দেবেনা। তাই তাসাউফের ছাত্রকে সর্ব প্রথম নিয়্যত শুদ্ধ করার ব্যাপারে তাগিদ দেওয়া হয়। এখান থেকেই তার সফর শুরু। যখন নিয়্যত শুদ্ধ হয়ে যায় তখন আল্লাহ তা'আলার রহমত অবতীর্ণ হতে থাকে। মা'রেফাতের এই রাস্তা মানুষকে সেই স্তরে পৌঁছে দেয় যেন সে ইবাদত করার সময় আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে পাচ্ছে। যখন কেউ এই স্তরে উপনীত হয় তখন তার চরিত্র সুন্দর,মার্জিত ও প্রশংসনীয় হয়ে যায়।

তাসাউফের আসল উদ্দেশ্য শরিয়ত মতে চলা। শরিয়ত বাদ দিয়ে তরিকতের কোনও মূল্য নাই। বুজুর্গানে দীন মানুষের আত্মশুদ্ধির জন্য যেসমস্ত পন্থা অবলম্বনের কথা বলে থাকেন, তা আসল উদ্দেশ্য নয়। আসল উদ্দেশ্য হল বুজুর্গানে দ্বীনের সহযোগিতায় শরিয়ত মতে চলা, যার হুকুম কুরআন হাদিসে এসেছে।

আগের তুলনায় এখন মানুষের ব্যস্ততা বেড়েছে। মানুষের কাছে আজকাল আত্মশুদ্ধির পেছনে ব্যয় করার মতো সময় অনেক কম । যার কারণে নিজে নিজের আত্মশুদ্ধি করার সম্ভাবনা ক্ষীণ। তাই এমন আল্লাহ ওয়ালা মানুষদের সাথে সম্পর্ক রাখতে হবে, যারা পুরোপুরি কোরআন হাদিস অনুযায়ী নিজের জীবন পরিচালনা করে। যাদের কাছে দুনিয়ার লোভ দেখা যায় না। যাদের সংস্পর্শে আসলে আল্লাহর ভয়, আখেরাতের ধ্যান অন্তরে জাগ্রত হয়। যারা মানুষের কাছ থেকে দুনিয়াবি ফায়দা লাভ করেন না। মান-সম্মান, অর্থ-বিত্ত কিছুই চান না।

আজ কাল আমরা যে পরিবেশে বাস করছি তা গুনাহ আর বিভিন্ন অপরাধে ভরা। মানুষের জীবন পরিবেশের কারণে খুব বেশি প্রভাবিত হয়।

একবার সাহাবায়ে কেরাম সহ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাউমে আ'দ এর বস্তি হয়ে যাওয়ার সময় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে ফেললেন, এবং সাহাবায়ে কেরামকে বস্তিটি দ্রুত অতিক্রম করার হুকুম দিলেন। এতে বুঝা যায় পরিবেশের প্রভাবকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব গুরুত্ব দিতেন।

স্বভাবত: দেখা যায় মানুষ যে রূপ পরিবেশে লালিত হয় সেই পরিবেশ অনুযায়ী তার মন-মেজাজ চিন্তা-চেতনা বেড়ে উঠে। তাই আল্লাহ ওয়ালা বুজুর্গ ব্যক্তিগণের সান্নিধ্যে এসে অনেক গর্হিত কাজে অভ্যস্ত মানুষও সুশীল ও ভদ্র হয়ে যেতে দেখা যায়। আর অনেকে সম্পূর্ণ ভাল হতে না পারলেও অন্তত কিছুক্ষণের জন্য হলেও তার অন্তরে আল্লাহর ভয় জাগ্রত হয়। গুনাহ সমূহের জন্য লজ্জিত হয়। তাওবা করার সুযোগ হয়।

অনেকেই বলে থাকেন আজকাল সেই রকম আল্লাহ ওয়ালা মানুষ নাই। যাদের সান্নিধ্যে এসে মানুষ অপরাধ ছেড়ে দ্বীনদার হতে পারে। এটা শয়তানের একটা ধোঁকা।

মনে রাখা দরকার আল্লাহ ওয়ালা দ্বীনদার ব্যক্তি সব সময় ছিল এবং থাকবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন।

يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين

হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক।

এর দ্বারা বুঝা গেল সত্যবাদী নেককার লোক আল্লাহ তা'লা প্রত্যেক যুগে প্রেরণ করেন। নাহলে তিনি মানুষ কে সত্যবাদীদের সাথে থাকার হুকুম দিতেন না। সেই সব নেককার ব্যক্তিদেরকে খুঁজে বের করা আমাদের দায়িত্ব। তবে হ্যাঁ সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে বেলায়েত এর মধ্যেও অনেক দুর্বলতা এসে গেছে। একটা যুগ ছিল যখন উস্তাদ শাগরেদ উভয়ই কামেল ছিল। তখন জুনাইদ বাগদাদী আর হাসান বসরীর মত নেককার বুজুর্গকে উস্তাদ হিসেবে পাওয়া যেত। এখন তাদের মতো বুজুর্গ তালাস করা বৃথা। আজকাল আমাদের জন্য জুনাইদ বাগদাদী আর হাসান বসরী হচ্ছেন সেই সব নেককার আলেম ব্যক্তি যাদের সাহচর্যে আসলে মানুষের মনে আল্লাহর মুহাববাত সৃষ্টি হয়। আখেরাতের ফিকির আসে। দুনিয়ার মুহাব্বাত হ্রাস পেতে থাকে। চরিত্র ভাল হয়ে যায়। যিনি কুরআন হাদিস মতে চলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাতের পাবন্দি করেন। তাহলে বুঝে নিতে পারেন তিনি আল্লাহ ওয়ালা ব্যাক্তি।

পরিশেষে বলতে চাই দুনিয়ার লোভ-লালসা ত্যাগ করে নেককার বুজুর্গ ব্যাক্তিদের সাহচর্যে থেকে নিজের চরিত্র ঠিক করে শরীয়াতানুযায়ী নিজের জীবন পরিচালনা করলে দুনিয়া আখেরাত দু জাহানেই শান্তি পাওয়া সম্ভব।

লেখক: *প্রবন্ধকার, অনুবাদক, ফাজেলে জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া,কাতার প্রবাসী।*

জিজ্ঞাসা ও শরয়ী সমাধান

কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা বাংলাদেশ

পরিচালনায়: মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ বসুন্ধরা, ঢাকা

প্রসঙ্গঃ পীরের কাছে মহিলাদের বাইআত গ্রহণ।

মুহাম্মদ শাহিন আলম
গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ।

জিজ্ঞাসাঃ মহিলারা কোন পীরের নিকট মুরিদ হতে পারবে কি না? তাতে স্বামী থাকা না থাকার মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য আছে কি না? মুরিদ হতে পারলে তার পদ্ধতি ও নিয়ম-নীতি কি? কুরআন হাদীছের আলোকে জানালে কৃতজ্ঞ হব।

সমাধানঃ শরীয়তের মূলনীতি হল যদি কোন মুস্তাহাব বা সুন্নাত আদায় করতে গিয়ে ওয়াজিব বা ফরজ বিধান লংঘন করতে হয়, তবে সে মুস্তাহাব বা সুন্নাত পরিহার করা আবশ্যক। তদ্রুপ কোন জায়েয কাজ করতে গিয়ে নাজায়েয কাজে সম্পৃক্ত হওয়ার আশংকা থাকলে সেরূপ জায়েয কাজ থেকে দূরে থাকা জরুরী। সুতরাং নিজেকে দ্বীনের উপর সঠিকভাবে পরিচালিত করার জন্য কামেল হক্কানী পীরের বাইআত গ্রহণ করা বা মুরীদ হওয়া মুস্তাহাব। তবে এটা করতে গিয়ে শরীয়ত নিষিদ্ধ বা হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার কোনই অবকাশ নেই। অতএব মহিলাদের জন্য কামেল পীরের নিকট (যার মধ্যে পীর হওয়ার সকল শর্তাবলী বিদ্যমান) পরিপূর্ণ শরয়ী পর্দা রক্ষার মাধ্যমে সম্ভব হলে মুরীদ হওয়ার অনুমতি আছে। কোন অবস্থাতে ফাসেক বা ভণ্ড পীরের নিকট মুরীদ হওয়ার অনুমতি শরীয়তে নেই। (বুখারী শরীফ ২/৭২৬, ফতওয়ায়ে হক্কানিয়া ২/২৪৫, ফতওয়ায়ে রশীদিয়া ২২৬)

প্রসঙ্গঃ তাহারাত বা নাপাকী থেকে পাকী অর্জন করা।

মুহাম্মদ রিয়াজ উদ্দীন (ফারুকী)
সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।

জিজ্ঞাসাঃ এক বালতি পানিতে এক ফোটা নাজাসাত বা নাপাকী পতিত হলে বালতির পুরো পানিই নাপাক হয়ে যায়। আমার জানার বিষয় হলো, আমি নাপাক কাপড় ধৌত করার সময় যদি বালতিতে কাপড়টা ডুবিয়ে ঐ পানি ফেলে দিয়ে পূনরায় বালতিতে পানি নিয়ে আবার ঐ পানিতে কাপড়টা ডুবিয়ে ধৌত করি। এখানে কথা হলো প্রথম, বালতি থেকে পানি ফেলে দিলেওতো কয়েক ফোটা পানি সেখানে থেকে যায়। তাহলে সে বালতিতে দ্বিতীয়বার পানি নিলে সেটা পাক হবে কিভাবে? এভাবে কাপড়টা তিনবার ধৌত করলে কাপড় পাক হবে কি না?

সমাধানঃ নাপাক কাপড়কে তিনবার ধৌত করা হলে এবং প্রতিবার খুব ভালোভাবে নিংড়ানো হলে কাপড় পাক হয়ে যায়। এভাবে কাপড় ধৌত করার সময় বালতিতে লেগে থাকা পানির সাথে নতুন পানি মিশানোর কারণে কোন অসুবিধা নেই। কারণ শরীয়তে এ বিষয়ে কিছুটা শিথিলতা আরোপ করা হয়েছে। (ফতওয়ায়ে হিন্দিয়া ১/২৭, আল-বাহরুর রায়েক ১/৩৮৬)

প্রসঙ্গঃ কিস্তিতে টাকা নিয়ে ব্যবসা করা।

মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম
বসুন্ধরা, ঢাকা।

জিজ্ঞাসাঃ আমরা বিশজন যুবক গ্রামের বাড়ীতে একটি সমিতি করেছি। সেখানে আমরা প্রতি মাসে বিশ হাজার টাকা জমা করি। ক. জমাকৃত টাকা হতে একজন ব্যক্তিকে এক লক্ষ টাকা দিয়ে একটি গাড়ী ক্রয় করে এভাবে বিক্রি করি যে, ঐ ব্যক্তি প্রতিমাসে দশহাজার টাকা হিসাবে কিস্তি দিয়ে এক বছরে আমাদেরকে এক লক্ষ বিশহাজার টাকা দিবে। খ. আরেকজন ব্যক্তি আমাদের নিকট হতে গাছের ব্যবসার কথা বলে দুই লক্ষ টাকা নিয়েছে। সে ব্যক্তিও প্রতি মাসে বিশ হাজার টাকা কিস্তি হিসাবে এক বছরে আমাদেরকে দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা দিবে।এখানে আমার জানার বিষয় হলো, অতিরিক্ত বিশ হাজার এবং চল্লিশ হাজার টাকা নেয়া সুদ হবে কি না?

সমাধানঃ শরীয়তের দৃষ্টিতে পন্য বিক্রয় করে মুনাফা অর্জন করা বৈধ। আর পণ্য হাত বদল না করে বা মুদারাবা চুক্তি না করে সরাসরি টাকার বিনিময়ে টাকা মুনাফা করা অবৈধ ও হারাম। এই হিসেবে আপনাদের গাড়ী বিক্রয়ের মুনাফা হালাল এবং গাছের ব্যবসার জন্য দেয়া টাকার মুনাফা হারাম বলে বিবেচিত হবে। (মাবসূত ১৪/৩৫, হেদায়া ৩/২১, রদ্দুল মুহতার ৬/৭৫৭, ফতওয়ায়ে মাহমূদিয়া ১৩/৩৫০, হক্কানীয়া ৬/২০৩)

প্রসঙ্গঃ কুইজ প্রতিযোগিতা

মুহাম্মদ অলিউর রহমান
নন্দীপাড়া, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ।

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের এলাকায় বিভিন্ন সংগঠন বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকে। এতে বিভিন্ন বিষয়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রশ্ন ছাপিয়ে ফরম আকারে বিক্রি করে থাকে। উত্তর দাতাদের মধ্য থেকে যাদের উত্তর

সঠিক হয় তাদের কয়েকজনকে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুরস্কার দেয়া হয়। সে পুরস্কারের জিনিস ক্রয় করা হয় ফরম বিক্রিত টাকা দিয়ে। আমার জানার বিষয় হলো এরূপ কুইজ প্রতিযোগিতা জায়েয হবে কি না? যদি না জায়েয হয় তাহলে এর জায়েয পদ্ধতি কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

সমাধানঃ প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে কুইজ প্রতিযোগীতা না জায়েয। কারণ এটা জুয়ার অন্তর্ভুক্ত। তবে যদি প্রতিযোগীদের কাছ থেকে ফরমের টাকা না নেয়া হয় এবং উক্ত প্রতিযোগীতা বাস্তব জ্ঞান সম্মত বা কোন দ্বীনী বিষয়ে হয় তাহলে তা জায়েয আছে। (কুরআনুল কারীম, সূরায়ে মায়েদা, আয়াত-৯০, রদ্দুল মুহতার ৬/৪০৩, এমদাদুল আহকাম: ৪/৩৭৭, আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল: ৭/৩৩৫)

প্রসঙ্গঃ ইসলামী সঙ্গীত ইত্যাদি ভিডিও করা।

মুহাম্মদ হায়দার তালুকদার
আলিনগর ভোলা।

জিজ্ঞাসাঃ অন্যান্য আধুনিক গানের মত ইসলামী সঙ্গীতেরও বর্তমানে ভিডিও ক্যাসেট তৈরী করা হচ্ছে, শরীয়তের দৃষ্টিতে ঐ সকল ভিডিও ক্যাসেট তৈরী করা, ক্রয় করা বা দেখা বৈধ কি না?

সমাধানঃ যেহেতু এধরনের ভিডিও ক্যাসেটে স্বয়ং শিল্পী ও বিভিন্ন প্রাণীর ছবি ধারণ করা হয়, যা শরয়ী দৃষ্টিতে বৈধ নয় তাই এ ধরনের ক্যাসেট তৈরী করা, ক্রয় বিক্রয় করা এবং দেখা বৈধ নয়। (বুখারী শরীফ ২/৮৮০, উমদাতুল কারী ২২/৭০, ফতহুল বারী ১০/৩৯৭, আসসিরাজুল ওয়াহহাজ ২/৩০০, আওজাযুল মাসালিক ৬/৩৯১, আরেজাতুল আহওয়াজী ১০/১৮৬, তুহফাতুল আহওয়াজী ৮/৭২, এরশাদুসসারী ৮/৪৮১, ইকমালুল ইকমাল ৭/২৫২, রদ্দুল মুহতার ৬/৩৬১, হাশিয়ায়ে তাহতাবী আলাদ্দুর ১/২৭৩, আলমাওসূআতুল ফিকহিয়্যা ১২/১০২, ফতওয়ায়ে রহীমিয়া ১/৯৫, জাওয়াহেরুল ফিকহ ৩/২২৩ ইত্যাদি)

প্রসঙ্গঃ মুসাফির

মুহাম্মদ মাজহারুল ইসলাম
সানকা, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।

জিজ্ঞাসাঃ আমার স্ত্রী ময়মনসিংহ সদরে নিজের বাপের বাড়ীতে অবস্থান করে। আমি ঢাকা থেকে যাওয়ার পথে প্রতি সপ্তাহে শশুর বাড়ীতে দুই তিন দিন অবস্থান করে আবার ঢাকায় চলে আসি। এমতাবস্থায় মুকিম না মুসাফির। আমার গ্রামের বাড়ী থেকে সদর প্রায় ৩০ কি: মি: এবং ঢাকা ১৪০ কি: মি:।

সমাধানঃ প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় অর্থাৎ কোথাও একসাথে ১৫ দিন না থাকলে আপনি মুসাফির থাকবেন। (ফতওয়া কাজী খান ১/৮০, ইমদাদুল আহকাম ১/৭২৩)

প্রসঙ্গঃ তাহারাত

মুহাম্মদ তাকীউদ্দীন
সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।

জিজ্ঞাসাঃ আমি একবার নামায পড়া অবস্থায় দেখি যে, পাঞ্জাবীতে কয়েক স্থানে মশার রক্ত এমনকি সব মিলালে এক দেরহাম থেকে বেশি হবে। এমতাবস্থায় নামায হবে কি না? যদি না হয় তাহলে সে নামাযের হুকুম কি?

সমাধানঃ মশার রক্ত পাক। তাই আপনার পাঞ্জাবীতে কয়েক জায়গায় লাগা রক্ত মিলে এক দেরহাম পরিমাণ বা এর চেয়ে বেশি হলেও আপনার নামায সহীহ হয়ে গেছে। (বাদায়েউস সানায়ে ১/৩৬৪, ক্বাজী খান ১/১০, উমদাতুল ফিকহ ১/২৬৫, বেহেশতী জেওর ২/৩)

প্রসঙ্গঃ ফরজ নামায আদায়ের পর অন্য নামায আদায়ের উত্তম স্থান।

মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ
পরশুরাম, ফেনী।

জিজ্ঞাসাঃ ইমাম সাহেব ফরজ নামায শেষ করে বাকী নামায সেই স্থানে পড়া উত্তম নাকি স্থান পরিবর্তন করে পড়া উত্তম?

সমাধানঃ ইমাম সাহেব ফরজ নামায শেষ করে সুন্নাত নামায ডানে বামে বা পিছনে এসে আদায় করা উত্তম। (সুনানে আবু দাউদ ১/১৯, দুররুল মুখতার ১/৫৩১, রাদ্দুল মুহতার ১/৫৩১, ফতওয়ায়ে হক্কানিয়া ৩/১০৮ইত্যাদি)

প্রসঙ্গঃ ইমাম সাহেবকে লোকমা দেয়া।

জিজ্ঞাসাঃ তিন আয়াত পরিমাণ পাঠ করার পূর্বে বা পরে মুক্তাদি লোকমা দিলে ইমাম সাহেব ঐ লোকমা গ্রহণ করলে বা না করলে তার হুকুম কি?

সমাধানঃ তিন আয়াত পরিমাণ পড়ার পূর্বে বা পরে মুক্তাদীর দেয়া লোকমা ইমাম সাহেব গ্রহণ করুক বা না করুক উভয় অবস্থাতেই নামায সহীহ হয়ে যাবে। তবে তিন আয়াত পরিমাণ পড়া হয়ে গেলে লোকমার অপেক্ষা না করে রুকুতে চলে যাওয়া এবং তিন আয়াতের কম হলে অন্য সূরা থেকে তিলাওয়াত করা বাঞ্ছনীয়। (দুররুল মুখতার ১/৬২২, রাদ্দুল মুহতার ১/৬২২, এমদাদুল মুফতিয়্যীন ৩০৮, ফতওয়ায়ে হক্কানিয়া ৩/১৭৯ ইত্যাদি)

প্রসঙ্গঃ টয়লেটের সাথে লাগানো অযুখানায় বিসমিল্লাহ পাঠ করা।

জিজ্ঞাসাঃ টয়লেটের সাথে লাগানো অযুখানা বা গোসলখানাতে بسم الله থেকে নিয়ে অযুর দু'আসমূহ পাঠ করা কি বৈধ?

সমাধানঃ টয়লেটের সাথে লাগানো অজুখানা বা গোসলখানায় মাঝখানে যদি এমন প্রাচীর বা পার্টিশন থাকে

যা দ্বারা দুটিকে দুই স্থান হিসেবে গণ্য করা যায়, তাহলে উক্ত স্থানে بسم الله থেকে নিয়ে অজুর দু'আসমূহ পড়া জায়েয, অন্যথায় পড়া জায়েয নেই। (রাদ্দুল মুহতার /৩৪৪, ফতওয়ায়ে উছমানিয়া ১/৩১৩, আহসানুল ফতাওয়া ২/৩৭ ইত্যাদি)

প্রসঙ্গঃ সরকারী খাস জায়গাতে মসজিদ নির্মাণ

ইমরান হুসাইন
গোপালগঞ্জ।

জিজ্ঞাসাঃ সরকারী খাস জমিতে মসজিদ নির্মাণ করা কতটুকু শরীয়ত সিদ্ধ? অথচ তাতে রাষ্ট্রের সকল নাগরিক তথা হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান এমন কি ধর্ম শূন্য ব্যক্তিরও অধিকার আছে।

সমাধানাঃ সরকারী খাস জমিতে সরকারের অনুমতি ছাড়া মসজিদ নির্মাণ বৈধ নয়। অনুমিত ছাড়া নির্মাণ করলে ঐ মসজিদে নামায আদায় হয়ে যাবে, তবে শরয়ী মসজিদে নামায আদায়ের ছওয়াব পাওয়া যাবে না। (রাদ্দুল মুহতার ৪/৩৪০, কেফায়াতুল মুফতী ৭/৪৪, ফতওয়ায়ে হক্কানিয়া ৫/৯৪, ফতওয়ায়ে রহীমিয়া ৬/১২৭ ইত্যাদি)

প্রসঙ্গঃ বিয়ে

আব্দুস সালাম

জিজ্ঞাসা: জনৈক ব্যক্তির স্ত্রী এক মেয়ে সন্তান রেখে মারা যায়। অত:পর ঐ ব্যক্তি দ্বিতীয় আরেকটি বিয়ে করে। যে মহিলার আগের স্বামী থেকে একটি ছেলে সন্তান রয়েছে। এখন জানার বিষয় হল প্রথম স্ত্রীর মেয়ের মেয়ে ও দ্বিতীয় স্ত্রীর ছেলে যেটা আগের স্বামী থেকে হয়েছে পরস্পর বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে কি না?

সমাধানঃ শরীয়া দৃষ্টিকোণে যদি হুরমাতের অন্যকোন কারণ না থাকে তাহলে সৎমায়ের আগের ঘরের মেয়ে অথবা মেয়ের মেয়ের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া জায়েয। বিধায় প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় উক্ত ছেলে মেয়ে পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া জায়েয হবে। (আব্দুর ৪/১১২, রদ্দুল মুহতার ৪/১১২, ফতওয়ায়ে হক্কানিয়া ৪/৩৩০, ফতওয়ায়ে মাহমূদিয়া ৪/৪১১, ইমদাদুল আহকাম ২/২৫১)

লেখা আহবান **লেখা আহবান** **লেখা আহবান**

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, মহান আল্লাহ তাআলার রহমতের উপর নির্ভর করে ইনশাআল্লাহ নিয়মিত প্রকাশনার জগতে আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছে বহুদিনের প্রতীক্ষিত সময়ের চাহিদা পূরণে আহলে সুন্নাত ওয়ালজামাআতের দাওয়াতী ও আত্মশুদ্ধী মূলক একটি একনিষ্ট মুখপত্র মাসিক আল- আবরার।

তাই আল-আবরার পরিবার অত্যন্ত আনন্দের সাথে আহবান জানাচ্ছে, সমাজের বিজ্ঞ, দক্ষ, সহনশীল ও মননশীল ইসলামিক স্কলার, গবেষক, কবি, সাহিত্যিক ও লেখকদের মূল্যবান তাত্ত্বিক লিখনী ও কবিতার, যা পূরণ করবে সমাজের ইসলাম প্রিয় সর্বসাধারণের ধর্মীয় চাহিদা ও মিটাবে তাদের পিপাসা।

লেখা পাঠানোর নিয়মাবলী

১। লেখককে অবশ্যই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অনুসারী হতে হবে।
২। লেখকের পূর্ণ ঠিকানা পেশ করতে হবে।
৩। লেখা বিষয়ভিত্তিক, যুগোপযোগী, গবেষণালব্ধ ও তত্ত্ববহুল হতে হবে।
৪। কোন সাম্প্রদায়িক, রাজনৈতিক ও বিতর্কিত লেখা গ্রহণযোগ্য হবে না।
৫। প্রত্যেক বিষয়ের রেফারেন্স সবিস্তারে সাথে উল্লেখ থাকতে হবে।
৬। লেখা এ৪ সাইজের কাগজে এক পিঠে কম্পোজ করে অথবা সুন্দর হস্তাক্ষরে স্পষ্টভাবে লিখে দিতে হবে।
৭। সম্পাদনা দফতর লেখা নির্বাচন, কাটছাট করার সম্পূর্ণ ইখতিয়ার রাখবে।
৮। অনির্বাচিত লেখা ফেরৎ পাঠানো হবে না।
৯। লেখা প্রতি আরবী মাসের পাঁচ তারিখের মধ্যে সম্পাদনা দফতরে পৌছতে হবে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

প্রকাশনা দফতরঃ মাসিক আল-আবরার
ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বাংলাদেশ,
ব্লক ডি, ফক্বীহুল মিল্লাত স্মরণী, বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, বাড্ডা, ঢাকা।
ই-মেইল : monthlyalabrar@gmail.com

উদীয়মান কাফেলা

হযরত ফক্বীহুল মিল্লাত দা. বা. এর ইফতা বিভাগের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে দিকনির্দেশনামূলক বয়ান

نحمده ونصلي على رسوله الكريم
قال النبى ﷺ : من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين۔

আল্লাহ পাকের লাখো শুকরিয়া, আমরা আজ এই আলোচনা মজলিসে বসতে পেরেছি। অনেক দিন যাবৎ তোমাদের উদ্দেশ্যে দু'চারটি দিক নির্দেশনামূলক কথা বলার ইচ্ছা। কিন্তু সুযোগ হচ্ছিল না। অল্লাহর অশেষ মেহেরবানী, আজ সেই সুযোগ আমাদের নসীব হয়েছে। আমি পবিত্র হাদীছ সম্ভার থেকে একটি হাদীস তোমাদের সামনে পাঠ করেছি। উক্ত হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা যার সম্পর্কে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের ইচ্ছা করেন তাকে দ্বীনের "ফাকাহাত" তথা শরীয়তের প্রগাঢ় জ্ঞান দান করেন।

স্মর্তব্য বিষয় হলো শরীয়তের বিধানাবলীর এই "ফাকাহাত" অর্জিত হওয়ার জন্য আখলাকে নববী তথা তাকওয়া অর্জন করা অপরিহার্য্য ও পূর্বশর্ত। কারণ يفقهه فى الدين এর ফায়েল (কর্তা) হচ্ছেন আল্লাহ। অর্থাৎ ফাকাহাত দান করার মালিক তিনিই। আল্লাহ পাকের যেহেতু সর্বাধিক পছন্দনীয় বস্তু হলো বান্দার তাকওয়া তাই যার মধ্যে তাকওয়া অর্জিত হবে না এবং তা অর্জনে উদাসীন ও গাফেল থাকবে তিনিও তাঁর পছন্দনীয় ফাকাহাত তথা শরীয়তের জ্ঞানভাণ্ডার তাকে দান করবেন না। এটাই স্বাভাবিক। তাই মালূমাতের সাথে সাথে তাকওয়া অর্জনে সচেষ্ট থাকবে। যদি তোমাদের মধ্যে তাকওয়া আসতে থাকে তাহলে তুমি বুঝতে পারবে, তোমার সাথে আল্লাহ তা'আলা ভাল ও কল্যাণের ইচ্ছা করেছেন। অন্যথায় তোমার মধ্যে হাকীকী ইলম তো আসবেই না, দু' চার শব্দ জ্ঞান এলেও এর দ্বারা, মওলা পাক তোমার প্রতি কল্যাণের ইরাদা করেছেন, সে তামান্না করতে পারবে না। তাই তোমাদের জন্য বৎসরের শুরুতেই ইফতা বিভাগে ভর্তি নেয়ার সময় দু'টি বিষয়ে দৃঢ় ইচ্ছা বদ্ধমূল করে নেয়া উচিৎ।

এক. সদা সর্বদা দিল ও দেমাগকে আল্লাহর মা'রেফাতে লাগিয়ে রাখা এবং সর্ব ক্ষেত্রে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের মানসিকতা তৈরী করা। আমল আখলাক, লেখা-পড়া সেই মোতাবেক করার দৃঢ় প্রত্যয় গ্রহণ করা।

দুই. দিল ও দেমাগকে কিতাবের সাথে জোড়ে রাখা। সদা-সর্বদা কিতাব মুতালাআ করা ও মাসআলা মাসায়েল বুঝা এবং চর্চায় থাকার আগ্রহ সৃষ্টির দৃঢ় প্রত্যয় নেয়া।

কিতাব মুতালাআর বিষয়ে দু'চারটি কথা বিশেষভাবে মেনে চলার চেষ্টা করবে। (মন যেমন চায়, যে কিতাব ইচ্ছা হয় কোন তারতীব ও নির্দেশনার গুরুত্ব না দিয়ে মুতালা'আ করতে যাবে না।) এতে সফলতা সুদূর পরাহত। যে সকল কিতাব বেশী উপকারী ও এই বিষয়ে জরুরী সেগুলো মুতালাআয় রাখতে হবে। কিছু কিছু কিতাব আছে যেগুলোতে বেশী হাত দেয়ার প্রয়োজন নেই। যেমন ফতওয়ায়ে আলমগীরী, সেরূপ অন্যান্য কিতাব যেগুলোতে শুধু মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে এবং যেগুলো বিভিন্ন কিতাব থেকে সংকলিত। কারণ এসকল কিতাব দ্বারা তুমি আলিম হবে কিন্তু ফক্বীহ ও মুফতিয়ানা মেজাজ সৃষ্টি হবে না। ফকীহ হতে চাইলে এবং মুফতীয়ানা মেজাজ তৈরী করতে হলে গুরুত্ব ও একাগ্রতার সাথে "ফতওয়ায়ে শামী" মুতালাআ করতে হবে। এটি এমন কিতাব যা তোমার মাঝে ফাকাহাত সৃষ্টি করবে এবং মুফতিয়ানা মেজায তৈরী করবে। দু'বৎসরে আর কিছু করতে পার আর না পার, শুধু মাত্র ফতওয়ায়ে শামীটাও যদি একাগ্রচিত্তে মুতালাআ করে শেষ করতে পার, তবে আমার বিশ্বাস এটুকুই সফলতা ও কামিয়াবীর জন্য যথেষ্ট প্রায়। এটি জীবনের জন্য বৃহৎ একটি পুঁজি স্বরূপ। মুতালাআ না করে শুধু তামরীনের (ফতওয়া অনুশীলনের) সংখ্যা বাড়িয়ে কোন লাভ নেই। হ্যাঁ ফতওয়া দেয়ার যোগ্যতা অর্জনের জন্য প্রাজ্ঞ মুফতীর কাছে তামরীন অবশ্যই করতে হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে একথা মনে করা ঠিক নয় যে, শুধু তামরীন করেই মুফতী হওয়া যাবে। বরং যারা মুতালাআ যেশি করে তারাই এ বিষয়ে মেহনতে বেশী সফলকাম হয়। জানি না তোমাদের মাঝে ক'জন পুরা ফতওয়ায়ে শামী আদ্যোপান্ত মুতালাআ করেছ। এতবড় একটি তালিবে ইলমের জমাআতে অন্তত বেশ ক'জন সেরূপ থাকা উচিৎ।

এখন থেকে বেশী সময় মুতালা'আতে ব্যয় করবে। যা করবে একাগ্রতার সাথে করবে। হোক তা অল্প। পৃষ্ঠা উল্টিয়ে সংখ্যা বাড়িয়ে এতটি কিতাব পড়ে কি লাভ? ভাল করে একাগ্রতার সাথে প্রয়োজনে একটা কিতাবই পড়বে, তাতে অনেক এগিয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

যে উস্তাদের অধীনে আমরা মেহনত করেছি তিনি ফতওয়ায়ে শামী এত বেশী ও এত গুরুত্বের সাথে মুতালাআ করেছিলেন, যে কোন মাসআলা পৃষ্ঠার কোন পার্শ্বে আছে তাও বলে দিতেন। পুরো ফতওয়ায়ে শামী যেন তাঁর চিত্তপটে অঙ্কিত ছিল। হযরতের শেষ বয়সে দৃষ্টি শক্তি হ্রাস পেয়েছিল। এ অবস্থাতেও তিনি কোন মাসআলা সম্পর্কে বলতেন, বেটা! কিতাবের অমুক পৃষ্ঠার অমুক দিকে দেখ। আমরা তাঁর নির্দেশনা মতে কিতাব খুলে দেখতে পেতাম মাসআলাটা হুবহু সেখানেই বিদ্যমান। মোট কথা হলো একটা কিতাবকে হলেও তোমরা তোমাদের জীবনের পুঁজি কর। অন্য কিতাব ক্রয় কর বা নাই কর প্রত্যেকে ফতওয়ায়ে শামীটা ক্রয় করে তোমাদের ব্যক্তিগত কুতুবখানাতে রাখবে। এটি ফতওয়ার জগতে একটি বিস্ময়কর, অতুলনীয় ও অনন্য কিতাব। এতে প্রায় মাসআলাকে বিভিন্ন কিতাব থেকে পর্যালোচনা করে লেখা হয়েছে এবং বহু কিতাবরে উদ্ধিতিও উল্লেখ করা হয়েছে।

এই পর্যন্ত গেল আরবী কিতাবের কথা। যদি তোমরা উর্দূ কিতাব হতে উপকৃত হতে চাও তবে "ইমদাদুল ফতওয়া"কে তোমাদের মুতাআলাতে মূল হিসেবে রাখবে। কারণ উর্দূ কিতাবাদীতে ইমদাদুল ফতওয়া একটি অতুলনীয় কিতাব। এই কিতাবও মুফতিয়ানা প্রজ্ঞা সৃষ্টির বেলায় অনন্য সহায়ক ও কার্যকরী। এর বর্ণনাভঙ্গী অত্যন্ত ফিকরী, জবাবও খুবই ফাকাহাতপূর্ণ। সে কারণে ফতওয়ায়ে শামী বুঝার জন্য যে পরিমাণ যোগ্যতা ও মেধা প্রয়োজন , এমদাদুল ফতওয়া বুঝার জন্যও তার চেয়ে যোগ্যতা কোন অংশে কম লাগে না। সুতরাং এই কিতাবদ্বয়ের প্রতি খুবই গুরুত্ব দেয়ার চেষ্টা করবে।

কেউ আবার একথা ভেবো না যে, অন্য কিতাব পড়তে নিষেধ করছি। অন্যগুলোও প্রয়োজনে মুতালাআ করবে তবে তুলনামূলক কম।

মোট কথা হলো: অধিক সময় মুতালাআতে ব্যয় করবে এবং সবসময় স্মরণ রাখবে যে, দারুল ইফতায় মুতালাআ 'মুকাদ্দাম' -অগ্রগণ্য। মুতালা'আ ছাড়া শুধু তামরীন করে মুফতী হওয়ার কোন উপায় নেই। নিয়মিত মুতালাআর পর যদি দু'চারটা তামরীন ও ইস্তিফতা পাও তাহলে সেগুলো কর। সবসময় ফিকির রাখবে যে, কি ভাবে ধীরে ধীরে শরীয়তের মাসআলাগুলো আয়ত্তে আসে।

যদি এই প্রতীক্ষা কর যে, উস্তাদ আমাকে মেহনত করাবেন, তাগীদ দিবেন, তখন করব। এটি মারাত্মক ভুল ধারনা ও বোকামী। আবার অবহেলা করে এদিক সেদিক ঘুরে ফিরে সময় নষ্ট করা নিজের পায়ে কুড়াল মারারই নামান্তর। এখন তোমরা সকলে বড়, বুঝের ছেলে, সকলে আলেম হয়েগেছ। অন্যান্য বিষয়ের ভাল মন্দ যেমন তোমরা নিজেরা ভাল বুঝ, লেখা পড়ার বেলায়ও আপন বুঝকে আরো তিক্ষ্ণতা দান করত: আরো বেশী উদ্যোগী হতে হবে। কেউ তোমাকে জোর করে ইলম দান করতে পারবে না। সফলতার দারপ্রান্তে পৌছতে হলে নিজেকে খুব পরিশ্রমী ও মেহনতী হতে হবে। একথা তোমাদের কারো অজানা নয়।

ভেবে দেখ, আল্লাহ না করুন, যদি এদিক সেদিক ঘুরা ফেরা ও হেলায় ফেলায় ২বছর সময় ব্যয় করে মুফতীর সার্টিফিকেট নিয়ে বাড়ী ফিরবে; নিজেই চিন্তা কর, তুমি কি মুফতী হলে না কি জাহেল? সেরূপ মুফতীরই বা কি মূল্য? সেরূপ মুফতীর কারণে সমাজ কি হেদায়াত পাবে নাকি গোমরাহ হবে?

পরিশেষে পঁচটি বিষয়ের প্রতি তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। যদি দ্বীন ও দুনিয়ার কামিয়াবী পেতে চাও এবং ফেকাহ ফতওয়ায় দক্ষতা অর্জন করতে চাও তবে এগুলো অর্জন করার আপ্রাণ চেষ্টা করবে এবং গুরুত্বসহকারে আকড়ে ধরবে।

এক. তাকওয়া অর্জন করো, সকল কাজেই আল্লাহর রেজামন্দী ও সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দিবে। তার ভয় অন্তরে সবসময় বিদ্যমান থাকে যেন। তার আদেশকে মেনে চলো এবং নিষেধকে বর্জন কর। সদা এই চেষ্টায় থাকবে যেন ক্ষনিকের জন্যও এ সম্পদ তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়। যদি মেহনত চালিয়ে এটি অর্জন করতে পার তাহলে দেখবে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার মধ্যে ফাকাহত দান করা হচ্ছে।

দুই. দারুল ইফতায় জমে বসে থাকার অভ্যাস করো। যদি কখনো খারাপ লাগে, মুতালাআ করতে মন না চায় তখনও দারুল ইফতা থেকে বের হবে না, বরং মুতালাআ না করলেও সেখানেই বসে কারো সাথে মাসআলার মুযাকারা কর। সামান্য খারাপ লাগলেই রুমে চলে যাওয়া, শুয়ে পড়া বা হাসি গল্প করা বড় খারাপ অভ্যাস। বরং দরসেগাহে বসে থাকলে দেখবে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় অনেক মাসআলা শেখা হয়ে যাচ্ছে। এভাবে চললে সফলতা তোমার পদচুম্বন করবে।

তিন. অতীব গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো শুধু মুতালাআ করা। মুতালাআ ছাড়া এক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জনের কোন পন্থা নেই। মোতাআলার অভ্যাস নিজের ভিতর অর্জন করার সর্বাত্মক চেষ্টা কর। যত বেশি পার মুতালাআতে সময় ব্যয় কর, আসল মাকসাদ হাসীল কর, জীবনটাকে ধন্য কর।

চার. হস্তাক্ষর সুন্দর করার চেষ্টা কর। আরবী , উর্দূ, বাংলা সবগুলো লেখাই সুন্দর করার চেষ্টা কর। বানান নির্ভূল করার মেহনত কর। অনুরূপ এমলার (বানান শুদ্ধকরণ) নিয়ম কানুনও আয়ত্ম কর। এগুলোতে কোন প্রকার গাফলতী করবে না। যার এগুলোও ঠিক নেই সে কিসের ফতওয়া লিখবে। তার দ্বারা তো সাধারণ কোন বিষয়ও লেখা শোভা পায় না। চেষ্টা করলে এগুলো খুব কম সময়ে আয়ত্ত করা যায়। তাই এর প্রতি গাফলতী করবে না।

পাঁচ. অত্যন্ত উপকারী ও ভাল ভাল সওয়াল যেগুলো পাও তামরীন করার চেষ্টা কর। তামরীনের সংখ্যা বাড়ানোকে উদ্দেশ্য বানিয়োনা বরং যেগুলোর তামরীন করবে অত্যন্ত তাহকীকের সাথে কর। বহু কিতাবের মুরাজাআত করে তামরীন করবে। তবে যেটা আমি বুঝাতে চাচ্ছি তা হলো, মুফতী হওয়ার জন্য তো তামরীন অতীব জরুরী, কিন্তু শুধু তামরীনে সময় কাটিয়ে দেয়া বোকামী।

যেকাজগুলোর কথা বলা হলো সবসময় এসব কাজে সময় ব্যয় করবে।

অবসর সময়ে যে মুতালাআ করবে তার মধ্যেও কিছু নিয়ম মেনে চলা জরুরী। তাতেও হাদীছ, তাফসীর ও ফিকাহর কিতাবই বেশি মুতালা'আ করবে। অন্যান্য ফনুনাতের দিকে বেশি সময় ব্যয় করার প্রয়োজন নেই। কারণ এই তিন বিষয় হল উলূমে মাকসূদী। এছাড়া নাহু, সরফ, আদব, মানতিক ইত্যাদি হলো ফনুন বা উসিলায়ে উলূম। এগুলো প্রয়োজনানুসারেই শিখতে হবে।

এপর্যন্ত দু'চার কথা যা বলা হল অতীতকে ভুলে গিয়ে এগুলো মেনে ভবিষ্যৎ জীবনকে সফল ও কামিয়াব করবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে এগুলোর উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

সংগ্রহে:

মুহাম্মদ মাসূম বিল্লাহ আল ই'তিসাম,
ইফতা ২য় বর্ষ, মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ,
বসুন্ধরা, ঢাকা।

৪৮পৃ এর পর:

মারকাযে বেফাক প্রতিনিধি দল

গত ৫-৩-২০১২ইং বাংলাদেশের অন্যতম কওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড "বেফাকুল মাদারিসিল আরবিয়্যা বাংলাদেশ" এর একটি প্রতিনিধি দল মারকাযুল ফিকরিল ইসলামীতে আগমন করেন। মারকাযের প্রতিষ্ঠাতা মহাপরিচালক, সম্মিলিত কওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড এর চেয়ারম্যান ফক্বীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান সাহেবের সাথে এই প্রতিনিধি দলের দীর্ঘক্ষণ মতবিনিময় ও আলোচনা হয়। হযরত ফক্বীহুল মিল্লাত বলেন, কওমী মাদরাসা এবং উলামায়ে কেরামের যে কোন প্রতিকুল অবস্থায় আমাদের মাধ্যমে আল্লাহ যা খেদমত নিয়েছেন এর স্বাক্ষী আপনারাই।

এখনও যদি কওমী মাদরাসার উন্নয়ন ও বিকাশে উলামায়েকেরাম কোন কর্মসূচী হাতে নেন তাতে যথাসম্ভব সহযোগিতা করেই যাব ইনশাআল্লাহ। এই প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন বেফাক সেক্রেটারী মাওলানা আব্দুল জব্বার সাহেব।

কক্সবাজার ইসলামিক রিসার্চ সেন্টারে আল্লামা সায়্যিদ আব্দুল মজীদ নদীম

নবীজি (সঃ) এর সুন্নাতের বাইরে মহান আল্লাহকে পাওয়ার কোন সুযোগ নাই

নিজস্ব প্রতিবেদক: ২৭ ফেব্রুয়ারী ঃ গতকাল স্বাস্থ্য নগরী কক্সবাজার শহরের ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি মাদ্রাসা ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার কক্সবাজর এর ৮সালা ইসলামী মহাসম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষনে আওলাদে রাসূল সায়্যিদ মাওলানা আব্দুল মজীদ নদীম বলেন, নবীজি (স:) এর সুন্নাতের বিপরিতে মানবতার শান্তি নাই।

মহানবী (স:) এর ৪০তম বংশধর আল্লামা নাদীম আরো বলেন- সায়্যিদুনা নূহ আলায়হিস সালামের আপন পুত্র "কিনআন" নবী আদর্শের পরিপন্থী হওয়াই নবীর পুত্র হয়েও অভিশপ্ত হয়েছে। তিনি কুরআন হাদীসের আলোকে চ্যালেঞ্জ করে বলেন, সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স:) এর আদর্শের বাইরে সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহকে পাওয়ার কোন সুযোগ নেই। তাই তিনি দুনিয়া আখিরাতের শান্তি প্রত্যাশী সমস্ত মানুষকে সর্বক্ষেত্রে নবীজী (স:) এর পূরোপুরী আদর্শ অনুসরন করার তাগিদ দেন।

সভাপতির ভাষনে সম্মিলিত কাওমী মদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড বাংলাদেশের চেয়ারম্যান ও বসুন্ধরা ইসলামিক রিসার্চ সেন্টারের মহা পরিরচালক ফক্বীহুল মিল্লাত আল্লামা মুফতী আব্দুর রহমান বলেন, কাওমী মাদ্রাসা গুলো সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক ভাবে জনগনের দ্বীনি সেবায় নিয়োজিত, এসব প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য আন্তরিক ভাবে দুআ করা সকল মুমিনের ঈমানী দায়িত্ব।

বিশেষ অথিতির বক্তব্যে পটিয়া মাদ্রাসার মহা পরিচালক ও কাওমী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ইত্তেহাদের মহাসচিব, শায়খুল হাদীস আল্লামা আব্দুল হালীম বোখারী বলেন, কাওমী মাদ্রাসা গুলো জনগণের প্রতিষ্ঠান, জনগনের সাহায্যে, জনগণের কল্যাণে পরিচালিত হয়। আরবী ভাষায় জনগনকে কাওম বলা হয়। এ জন্য এসব মাদ্রাসা গুলোকে কাওমী মাদ্রাসা বলে নামকরণ করা হয়েছে।

সর্বশেষে মোনাজাত পরিচালনা করেন জামিয়া দারুল মাআরিফের মহা পরিচালক আল্লামা মুহাম্মদ সুলতান যওক নদভী, অন্যান্যদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন, আল্লামা মুফতী এনামুল হক কাসেমী, আল্লামা জুনাইদ আল হাবীব,সেন্টার পরিচালক, আল্লামা মুফতী কিফায়তুল্লাহ শফিক।

গ্রন্থনায়: মাওলানা জসীমুদ্দীন কাসেমী।

তরানা

হামদ

মুহাম্মদ ইবরাহীম খলীল

বিশ্ব প্রভূর এক অনুপম কীর্তি
নিখিল জাহান হল তাই সৃষ্টি
খাল-বিল-নদী-নালা জমি-আসমান
সবি প্রভূ তোমার করুণা দান।
তোমারি সৃষ্টি জ্বীন আর ইনসান
তোমারি আরাধনায় থাকে সব মুসলমান
ধরায় পাঠালে তুমি রাসূলে আকরাম (স.)
সবি প্রভূ তোমার করুণা দান।
দিয়েছ মোদেরে শ্রেষ্ঠ জাতির মান
করেছ নাযিল তুমি আল-কুরআন
পাখিদের গানে গানে শুনি তোমার নাম
বলে যায় সবাই তুমি মহিয়ান
সবি তোমার করুণা দান।
সাগর-নদী-ঝর্ণাধারা বইছে আবহমান
চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা তোমারি অবদান
প্রভূ প্রভূ করে যেন উড়ে যায় এ প্রাণ
সবি প্রভূ তোমার করুণা দান।

নাআ'ত

মীর কুতুবুদ্দীন

ওগো রাসূলে আরবী! প্রিয়তম হে আমার
আকুল হয়ে, ব্যকুল মনে ভালবাসি তোমায়
রিক্ত হস্ত, বড় অসহায়।
তাই সঁপেছি প্রাণ, দিয়েছি হৃদয়, করেছি আপনজন
হে সাকিয়ে কাউসার! ফিরিয়ে দিওনা আমায়
বেঁধেছি আশায় বুক, বিচিয়েছি আঁচল
যদি নি:স্ব করে, দূরে ঠেলে পর কর আমায়
তবে, স্বপ্নরা মরবে কেঁদে কেঁদে
বিরহী প্লাবনে ঝড় বইবে হৃদয়ে
রক্তক্ষরণের উত্তাল ঢেউ উঠবে মনসিন্ধুতে
মুহূর্তেই আলোরা সব হারিয়ে যাবে-
অমানিশার অন্ধকারে
প্রিয়তম হে রাসূল স.! নি:স্ব করো না আমায়
ভিখারী আমি, প্রেম পিয়াসী তোমার
উজাড় করে ভালবাসতে পারিনি তোমায়
তাই বড় অপরাধী আমি
কর্মদিবসে ভূলো না আমায়
ওগো শাফায়াত কারী!-
করুণার বাহুডোরে বেঁধে নিও আমায়
ভালবেসে যেমন আপন করে নিয়ে ছিলে মরুবাসীকে।

নূরের আধার - আল-আবরার

আতাউল্লাহিবনে দিদারী

উদয় হল তোমার
ছিন্ন করে নিশির আঁধার
হে, রবের পুরস্কার
আল-আবরার আল-আবরার

অতি শুভ ক্ষনে
তোমার আগমনে
ফুল্ল হৃদয় সবার
আল-আবরার আল-আবরার

আশার আলো হয়ে
ন্যায়ের বার্তা বয়ে
তুমি আসবে বার বার
আল-আবরার আল-আবরার

হে জ্ঞানের সবিতা
গাই তোমার কবিতা
তুমি নূরের আধার
আল-আবরার আল-আবরার।

খবরা খবর

ইসলামী সম্মেলন সংস্থা বাংলাদেশের উদ্যোগে সারা দেশে আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত

মাওলানা আব্দুল্লাহ মসরূর ফরীদপুরী

অভাবিত উৎসাহ-উদ্দীপনা, ব্যাপক সফলতা ও লাখো জনতার উপস্থিতিতে দেশের ১৮টি বড় বড় জেলা শহরে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা বাংলাদেশের তত্ত্বাবধানে কওমী মাদরাসাসমূহের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন ২০১২ইং গত ফেব্রুয়ারী মাসে সমাপ্ত হয়েছে। এসকল সম্মেলনে বিশ্ব বিখ্যাত উলামায়ে কেরাম, আওলাদে রাসূল এবং দেশের প্রখ্যাত আলেমে দ্বীনগণ তাদের অমূল্য বয়ান ও তাকরীর প্রদান করেন।

সিরাজগঞ্জ সংবাদদাতাঃ

১ ফেব্রুয়ারী বুধবার সিরাগঞ্জের সর্ব বৃহৎ ও ঐতিহ্যবাহী রেলওয়ে ময়দানে আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন ২০১২ইং অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে লাখো ধর্মপ্রাণ মুসলমান উপস্থিত হয়ে বরেণ্য উলামায়ে কেরামের ওয়াজ ও নসীহত শ্রবন করেন। রেলওয়ের বিশাল মাঠে তিল ধারণের ঠাই ছিল না। আশপাশের রাস্তা-ঘাট, ও ঘর-বাড়ীতেও একই দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। উল্লেখ্য এটি ছিল আন্তর্জাতিক সম্মেলন ২০১২ইং এর উদ্বোধনী সম্মেলন।

পাবনা সংবাদ দাতাঃ

২ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার পাবনার সর্ববৃহৎ মাঠ কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দানে, আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে আওলাদে রাসূল স. দেশ বিদেশের বরেণ্য উলামায়েকেরাম মূল্যবান তাকরীর পেশ করেন। এখানে জনগণের মাঝে সম্মেলন নিয়ে পূর্বের চেয়ে বহুগুণে বেশি উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখে গেছে।

রংপুর প্রতিনিধিঃ

৩ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার রংপুরের সর্ববৃহৎ মাঠ, কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দানে লাখো ধর্মপ্রাণ মুসল্লি ও আলেম ওলামা-মাদরাসা ছাত্রের উপস্থিতিতে আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

দিনাজপুর সংবাদদাতা :

৪ ফেব্রুয়ারী শনিবার দিনাজপুরের ঐতিহ্যবাহী গোরেশহীদ ময়দানে আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

উল্লেখ্য প্রত্যক্ষ্যদর্শী সূত্রে জানা গেছে বৃহত্তর উত্তরবঙ্গের এই চারটি সম্মেলনে লাখো জনতার উপস্থিতি এবং এলাকার লোকজনের মাঝে পূর্বের চেয়ে অধিক আগ্রহ ও উদ্দীপনা ছিল।

সিলেট প্রতিনিধিঃ

৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারী রবি ও সোমবার সিলেটের দক্ষিণকাছ ইসলামিয়া মাদরাসা ময়দানে দু'দিন ব্যাপী আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিপুল উদ্দীপনা ও ধর্মীয় চেতনা নিয়ে সিলেটের আপামর জনসাধারণ এই সম্মেলনে যোগদান করেন। সম্মেলনের ব্যাপারে সিলেটবাসীর মাঝে এক চেতনাবহুল আবেগ লক্ষ্য করা গেছে।

চট্টগ্রাম প্রতনিধি :

৭,৮,৯ ফেব্রুয়ারী বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক জমিয়তুল ফালাহ ময়দানে তিন দিন ব্যাপী আন্তার্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে বিশ্ববিখ্যাত উলামা, আওলাদে রাসূল সা. এবং দেশের শীর্ষ ও বরেণ্য উলামায়েকেরাম তাদের মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করেন। এই সম্মেলন আশাতীতভাবে সফল হয় বলে প্রতক্ষ্যদর্শীরা জানান। চট্টগ্রাম অফিস সূত্রে জানা যায়, এবছর চট্টগ্রামে ২৭তম আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ও সুচারুরূপেই সম্পন্ন হয়। দেশ বিদেশের সকল আমন্ত্রিত ওলামায়েকেরাম যেমন তাশরীফ এনেছেন তেমনি মাদরাসার ছাত্র ও ওলামায়েকেরামের মাঝে ব্যাপক উদ্দীপনা ও উৎসাহ লক্ষ্য করা গেছে। সম্মেলনের ব্যাপক প্রচার এবং দেশ বিদেশের বেশ কজন প্রখ্যাত উলামায়েকেরামের উপস্থিতি আপামর জনসাধারণের মাঝে আশাতীত সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে।

গাজীপুর সংবাদদাতাঃ

১২ ফেব্রুয়ারী রবিবার গাজিপুর আশরাফিয়া মাদ্রাসা সংলগ্ন মাঠে ইসলামী মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন পূর্বের চেয়ে বহুগুন বেশি সফল হয়েছে বলে সূত্র জানিয়েছে।

হোমনা কুমিল্লা প্রতিনিধিঃ

১৩ ফেব্রুয়ারী হোমনা কুমিল্লার বাঞ্ছারামপুর কলেজ ময়দানে প্রথমবারের মত ইসলামী সম্মেলন সংস্থা বাংলাদেশের তত্তাবধানে সেখানকার কওমী মাদরাসাগুলোর উদ্যোগে আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। হোমনা অফিস সূত্রে জানাগেছে এটি অত্র এলাকার সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক

সম্মেলন হলেও আলেম-ওলামা, ছাত্রসমাজ এবং ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের ব্যাপক সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে। এই সম্মেলনে শ্রোতাদের উপস্থিতি ছিল অবাক হওয়ার মত। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে এটিছিল উক্ত এলাকার মুসলমানদের বৃহত্তর গণজমায়েত।

কেরানীগঞ্জ সংবাদদাতাঃ

১৪ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার কেরাণীগঞ্জ জামিআতুল আবরার সংলগ্ন ময়দানে আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে পূর্বের চেয়ে দ্বিগুণ লোকসমাগম হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

ফেনী প্রতিনিধিঃ

১৫ ও ১৬ ফেব্রুয়ারী, বুধ ও বৃহস্পতিবার ফেনী শহরের একাডেমী ময়দানে আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। দু'দিন ব্যাপী এই সম্মেলনের উভয় দিন লোকের জমায়েত ছিল আশাতীত। আমন্ত্রিত সকল উলামায়েকেরামের উপস্থিতি, স্থানীয় কওমী মাদরাসাগুলোর ব্যাপক অংশগ্রহণ এবং ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের ব্যাপক সাড়া এই সম্মেলনকে অভাবিত সফলতার দ্বার প্রান্তে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে।

নোয়াখালী প্রতিনিধিঃ

১৭ ও ১৮ ফেব্রুয়ারী শুক্র ও শনিবার নোয়াখালীর জেলা শহরের সুবিশাল মাঠ জেলা স্কুল ময়দানে আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে ছিল স্মরণকালের বৃহত্তর লোকসমাগম। সুবিশাল জেলা স্কুল ময়দানে লোকের ঠাই না হওয়ায় আশপাশের ভবন, গাছপালা, পথঘাট লোকে লোকারণ্য হয়। গাড়ী ও মোটর সাইকেলের বহর নিয়ে আওলাদে রাসূল সা. এবং বরেণ্য ওলামায়ে কেরামকে স্বাগত জানানো, আমজনতা কর্তৃক সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী মুসল্লীদের স্বতস্ফুর্ত খেদমত করা, প্রশাসনের ব্যাপক সহযোগিতা ইত্যাদি ব্যতিক্রমধর্মী এই সম্মেলন প্রতিবছরই আপামর জনসাধারণের মাঝে ব্যাপক সাড়া জাগাতে দেখা যায়।

ভোলা প্রতিনিধিঃ

১৯ ফেব্রুয়ারী রবিবার ভোলা জেলা শহরের সরকারী কলেজ ময়দানে অনুষ্ঠিত এবারের আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন। ভোলা জেলার কওমী মাদরাসাসমূহের উদ্যোগে, ইসলামী সম্মেলন সংস্থা বাংলাদেশের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে বিশাল গনজমায়েতের পাশাপাশি ভোলার প্রায় কওমী মাদরাসার আসাতেযা এবং ছাত্রগণ অংশ গ্রহণ করেন। উক্ত এলাকার সবচেয়ে বড় গণজামায়েত এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনের এটি তৃতীয় বছর। এবার পূর্বের দু'বছরের তুলনায় উপস্থিতির হার ছিল কয়েকগুণ বেশি।

ফরীদপুর সংবাদদাতাঃ

২২ ফেব্রুয়ারী বুধবার ইসলামী সম্মেলন সংস্থার তত্ত্বাবধানে আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ফরিদপুর প্রস্তাবিত শিশুপার্ক গ্রাণ্ড ময়দানে। হাজার হাজার ধর্মপ্রাণ মুসলমান, আলেম ওলামা এবং মাদরাসা ছাত্রদের এই বিশাল গনজমায়েত পুরো ফরিদপুরবাসীকে ধর্মীয় চেতনা-প্রেরণা ও গৌরবে মহিমান্বিত করে। ফরিদপুরের আবাল বৃদ্ধ সাধারণ মুসলমানও ব্যাপকহারে এই সম্মেলনে অংশ নিয়েছেন বলে সূত্র জানিয়েছে।

ককসবাজার প্রতিনিধিঃ

২৩,২৪ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতি ও শুক্রবার দেশের সর্ববৃহৎ পর্যটননগরী ককসবাজার জেলা শহরের পৌর প্রিপ্রেটারী স্কুল ময়দানে আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ইসলামী সম্মেলন সংস্থা বাংলাদেশের তত্ত্বাবধানে কক্সবাজার জেলা কওমী মাদরাসাসমূহের উদ্যোগে এই সম্মলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে আজ প্রায় ২০বছর থেকে। এবছর সম্মেলনে পূর্বের চেয়ে বহুগুণ বেশী উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। বৃহত্তর ককসবাজারের কওমী উলামায়েকেরামের এই সম্মেলন বহু প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে বর্তমানে সফলতার উল্লেখযোগ্য দ্বারে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে।

বিবাড়িয়া সংবাদদাতাঃ

২৬ ফেব্রুয়ারী রবিবার বিবাড়িয়া জেলার প্রাণকেন্দ্র আব্দুল কুদ্দুস মাখন ময়দানে আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিবাড়িয়াতে এটি সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলন হলেও লাখো জনতার উপস্থিতি, কর্তৃপক্ষের কর্মদক্ষতা এবং স্থানীয় ওলামায়েকেরাম, ছাত্র জনতা এবং ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের উৎসাহ ছিল বিস্ময়কর। সম্মেলন শুরুর আগথেকে ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ সম্মেলন স্থলে আসতে থাকে এবং এক পর্যায়ে এটি স্মরণ কালের সর্ববৃহৎ গনজমায়েতের রূপ নেয়। সম্মেলনকে ঘিরে পুরো বিবাড়িয়া শহরে ছিল সাজ সাজ রব, সম্মেলনে লাখো জনতার তাকবীর ধ্বনী যেন সে দিন এক ব্যতিক্রম বিবাড়িয়া উপভোগ করে আপামর জনসাধারণ।

সারা দেশের সম্মেলনগুলোতে বিশ্ব বিখ্যাত ওলামায়ে কেরাম, আওলাদে রাসূল এবং দেশের বরেণ্য উলামায়ে কেরামের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, হযরত মাওলানা মুফতী আবুল কাসেম নূমানী সাহেব, মুহতামিম দারুল উলুম দেওবন্দ, ভারত, খতীবে ইসলাম আওলাদে রাসূল সা. হযরত মাওলানা শাহ সায়্যিদ আব্দুল মজীদ নদীম সাহেব,পাকিস্তান, কায়েদে মিল্লাত হযরত মাওলানা ফজলুর রহমান সাহেব, পাকিস্তান, বাংলাদেশের শীর্ষ ওলামায়েকেরামের অন্যতম, ইসলামী সম্মেলন সংস্থা বাংলাদেশের সেক্রেটারী জেনারেল, সম্মিলিত কওমী মাদরাসা শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান, মুফতীয়ে আজম

বাংলাদেশ ফক্বীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান, প্রতিষ্ঠাতা মহাপরিচালক মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ বসুন্ধরা, ঢাকা, জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের মহাসচিব, ভারত রাজ্যসভার সদস্য সায়্যিদ মাহমূদ আসআ'দ মাদানী, হযরত মাওলানা মুফতী জমীল আহমদ সাহেব, মুহাদ্দিছ দারুল উলূম দেওবন্দ, প্রখ্যাত বুজুর্গ মাওলানা কুমরুজ্জামান সাহেব এলাহাবাদী, ভারত, সম্মিলিত কওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের সিনিয়র সহসভাপতি হযরত মাওলানা সুলতান যওক সাহেব, মুহতামিম দারুল মাআরিফ আল ইসলামিয়া চট্টগ্রাম, চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন ইসলামী বিদ্যাপীঠ জামিয়া ইসলামিয়া জিরির মহাপরিচালক হযরত মাওলানা শাহ মুহাম্মদ তৈয়ব সাহেব, উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ আলজামিয়া আল ইসলামিয়া পটিয়ার মুহতামিম হযরত মাওলানা মুফতী আব্দুল হালীম বোখারী সাহেব, বেফাকুল মাদারিস পাকিস্তানের সেক্রেটারী জেনারেল হযরত মাওলানা হানীফ জালন্দরী, প্রখ্যাত ওয়ায়েজ শায়খুল হাদীছ হযরত মাওলানা হাবীবুর রহমান সাহেব ফেনী, হযরত মাওলানা মুফতী সাঈদ আহমদ সাহেব, ফেনী, হযরত মাওলানা মুফতী এনামুল হক্ব কাসেমী সাহেব, হযরত মাওলানা মুফতী মীযানুর রহমান সাইদ, আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মুফাসসির হযরত মাওলানা যুবাইর আনসারী, প্রখ্যাত বক্তা হযরত মাওলানা জুনাইদ আলহাবীব, প্রখ্যাত মুফাসসির হযরত মাওলানা আব্দুল বাসেত সাহেব, হযরত মাওলানা খুরশেদ আলম কাসেমী সাহেব প্রমূখ।

প্রতিটি সম্মেলনের আখেরী মুনাজাতে সারা দুনিয়ার শান্তি, মুসলিম বিশ্বের অগ্রগতি ও মুক্তি, এদেশের উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলনের এই সফল ধারা সকল প্রকার ষড়যন্ত্রমুক্তভাবে স্থায়ী হওয়ার জন্য বিশেষভাবে দু'আ করা হয়।

এক বিবৃতিতে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা বাংলাদেশের সেক্রেটারী জেনারেল ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান সাহেব সারা দেশে শান্তিপূর্ণ ও ব্যাপক উৎসাহের মধ্যদিয়ে আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন সম্পন্ন হওয়ায় আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করেন এবং দেশবাসী, সংশ্লিষ্ট আয়োজক এবং কওমী মাদরাসার সকল ওলামায়েকেরাম ও ছাত্রজনতার প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

বিশ্বনন্দিত পটিয়া মাদ্রাসার ৭৪তম বার্ষিক আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলনে ফক্বীহুল মিল্লাত মুফ্‌তী আব্দুর রহমান

জামেয়ার প্রতিষ্ঠাতা রহ. এর দু'আ পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি- চট্টগ্রাম পটিয়া আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া তথা পটিয়া মাদ্রাসার ৭৪তম বার্ষিক আর্ন্তজাতিক ইসলামী মহা-সম্মেলনে সমবেত বিশাল জনসমাবেশে ফক্বীহুল মিল্লাত মুফ্‌তী আব্দুর রহমান বলেন, অত্র জামিয়ার সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা কুত্‌বুল আলম হযরত মাওলানা মুফ্‌তী আযীযুল হক সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলায়হি জামিয়ার জন্য যে দু'আ করেছিলেন, বর্তমানে তা পরিপূর্ণ ভাবে কবূল হয়ে গেছে বলে আমার বিশ্বাস।

সম্মিলিত ক্বাওমী মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড বাংলাদেশের সম্মানিত চেয়ারম্যান বসুন্ধরা মারকাযুল ফিকরিল ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মহা-পরিচালক ও পটিয়া মাদ্রাসার সাবেক উপ-পরিচালক ফক্বীহুল মিল্লাত মাওলানা শাহ মুফ্‌তী আব্দুর রহমান সাহেব দামাত বারাকাতুহুম গত ১লা মার্চ ২০১২ ইং পটিয়া মাদ্রাসার বার্ষিক সভায় প্রদত্ত ভাষণে আল-জামিয়া প্রতিষ্ঠাতার কসিদা বা কবিতা থেকে নিম্নোক্ত দুটি লাইন পাঠ করে বলেন-

یہ رشیدی باغ ہو اور قاسمی گلزار ہو ☆ یہ ضمیری فیض کا ایک خوش نما دربار ہو

আলজামিয়ার শৈশবকালে ছাত্র-শিক্ষকদের যখন থাকা খাওয়ার সুব্যবস্থা ছিলনা, অযু-গোসলের জন্য পর্যাপ্ত পানির ব্যবস্থাও ছিলনা, সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা কুত্‌বুল আলম হযরত মাওলানা মুফ্‌তী আযীযুল হক সাহেব রাহমাতুল্লহি আলায়হি উক্ত কাসীদার মাধ্যমে দু'আর সূরে বলতেন আয় আল্লাহ এই মাদ্রাসাকে হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গূহী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি এর যিকির ও ফিকরের বাগান বানিয়ে দাও। আয় আল্লাহ এই মাদ্রাসাকে হযরত মাওলানা কাসেম নানুতুবী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি এর উলূমে যাহেরী আর উলূমে বাতেনীর কেন্দ্র বানিয়ে দাও। আয় আল্লাহ এই মাদ্রাসাকে তুমি শায়খুল মাশায়েখ হযরত মাওলানা জমীরুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলায়হি এর রূহানী ফয়ূজ ও বারাকাতের আকর্ষণীয় দরবারে রূপান্তরিত করে দাও।

ফক্বীহুল মিল্লাত হযরত মাওলানা মুফ্‌তী আব্দুর রহমান বলেন অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে হযরত মুফতী সাহেব -রাহমাতুল্লাহি আলায়হি- ও সাবেক মুহতামিম হযরত হাজী সাহেব হুজুর রাহমাতুল্লাহি আলায়হির অক্লান্ত পরিশ্রম ও দু'আর বরকতে প্রতিষ্ঠাতা হযরতের সেই দু'আ অক্ষরে অক্ষরে কবূল হয়ে গেছে।

সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা দু'আর সূরে তার ভাষায় বলেছিলেন, "দরবার হো" এখন দাবীর সূরে বলা যেতে পারে "দরবার হে"।

হযরত ফক্বীহুল মিল্লাত দামাত বারাকাতুহুম হযরতের উক্ত লাইনে সামান্য পরিবর্তন করে নিম্নভাবে তার কসিদা পাঠ করে শোনান ।

یہ رشیدی باغ ہے اور قاسمی گلزار ہے ☆ یہ ضمیری فیض کا ایک خوش نما دربار ہے

হযরত ফক্বীহুল মিল্লাত দামাতবারাকাতুহুম কুরআন সুন্নাহর আলোকে দাবী করে বলেন সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাগণের মধ্যে পরিপূর্ণ ইখলাস থাকলে অত্র

জামিয়ার সার্বিক অগ্রগতির এই স্বর্ণধারা ক্বিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে ইন্‌শাআল্লহ।

হযরত ফক্বীহুল মিল্লাত দা. বা. এর দেশব্যাপী দাওয়াতী সফর

মুফতী মুঈন উদ্দীন :

মুসলিম উম্মাহর কল্যাণে নিবেদিত প্রাণ একটি নাম ফক্বীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান। হাঁটতে চলতে অক্ষম এমন বৃদ্ধ বয়সে হুইল চেয়ারে বসেই যার যাবতীয় চলা ফেরা। তথাপি একমাত্র দ্বীনি দাওয়াত ও মুসলমানদের মাঝে দ্বীনি চেতনা জাগ্রত করার লক্ষ্যে সারা দেশেই সফর করে বেড়ান এই মহামনীষী। গেল মাস ছিল ফেব্রুয়ারী মাস। যা বর্তমানে আন্তর্জাতিক সম্মেলনের মাস হিসেবেই খ্যাত। এমাসে দেশের ১৮টি বড় বড় জেলা শহরে আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রায় প্রত্যেকটি সম্মেলনে হযরত ফক্বীহুল মিল্লাত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যোগ দিয়েছেন। সূত্র মতে ১-ফেব্রুয়ারী ২০১২ সকালে বাংলাদেশের বৃহত্তম মাদরাসাসমূহের অন্যতম হযরতের পরিচালনাধীন বগুড়া জমিল মাদরাসায় তাশরীফ নিয়ে যান। দুপুরে কওমী মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড তানযীমের উদ্যোগে বিশ্ববিখ্যাত দারুল উলূম দেওবন্দের মুহতামিম সাহেবের আগমণ উপলক্ষ্যে আয়োজিত বিশাল এক সংবর্ধনাসভায় সভাপতিত্ব করেন। রাত্রে সিরাজগঞ্জ জেলার আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলনে সভাপতির ভাষণ দেন। পর দিন ঢাকা প্রত্যাবর্তন করে ২ ফেব্রুয়ারী জামিআ ইসলামিয়া মাইজদী নোয়াখালীতে তাশরীফ নিয়েযান। সেখানে নোয়াখালী লক্ষ্মীপুর জেলা কওমী মাদরাসা সংগঠন জমইয়্যাত কর্তৃক আয়োজিত জনাকীর্ণ এক উলামা-মাশায়েখ সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণ দেন। ৩ ফেব্রুয়ারী চট্টগ্রামের প্রাচীনতম ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র আল-জামিয়া আরবিয়া জিরির বার্ষিক ইসলামী সম্মেলনে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। ৪ ফেব্রুয়ারী ঢাকা প্রত্যাবর্তন করে বেশকটি গুরুত্বপূর্ণ মিটিংএ অংশগ্রহণ শেষে ৫ ফেব্রুয়ারী চট্টগ্রামের আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলনের ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম রওনা হন। সেখানে তিন দিন ব্যাপী সম্মেলন সমাপ্ত করে ১১ফেব্রুয়ারী বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী কওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড বাংলাদেশ-এর ৩০ সালা দস্তারবন্দী সম্মেলনে যোগ দেয়ার জন্য সিলেট গমন করেন। তথায় লক্ষ লক্ষ উলামা, ফুজালা, তালিবে ইলম এবং গনমানুষের উপস্থিতিতে মূল্যবান তাকরীর পেশ করেন। ১২ফেব্রুয়ারী আশরাফিয়া গাজীপুরের সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। ১৪ তারিখ জামিআতুল আবরার কেরানীগঞ্জ, ১৬ তারিখ ফেনীর দু'দিন ব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এবং ১৭, ১৮ নোয়াখালীতে আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলনে লাখো জনতার সামনে মূল্যবান বয়ান রাখেন। ১৯ তারিখ ভোলায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে লাখো জনতার উপস্থিতিতে বক্তব্য রাখেন। এর পর ঢাকা প্রত্যাগমন করে ২২ ফেব্রুয়ারী সুদূর ফরীদপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে তথায় সহস্র লোকের মজমায় জ্ঞানগর্ব ভাষণ দেন। একই দিন রাত ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করে ২৩ তারিখ ভোরেই ককসবাজারের উদ্দেশ্যে রওনা হন। তথায় ২৩, ২৪ তারিখ দুদিন ব্যাপী আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন সমাপ্ত করে ২৫ তারিখ ককসবাজার ইসলামিক রিসার্চ সেন্টারে মূল্যবান তাকরীর পেশ করেন। ককসবাজার থেকে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করে ২৬ তারিখ দুপুরের দিকে বিবাড়িয়ায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলনে সভাপতির বক্তব্য প্রদান করেন। এক প্রশ্নের জবাবে হযরত ফকীহুল মিল্লাত বলেন এখানে বান্দার কোন হাত নেই। সবই আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা। তিনি বান্দাকে যেভাবে পরিচালিত করেন বান্দা সেভাবেই পরিচালিত হতে বাধ্য। আরেক প্রশ্নের জবাবে বলেন, আন্তর্জাতিক সম্মেলনকে আল্লাহ পাক কবুল করেছেন, সে কারণেই সম্মেলনগুলোর জনপ্রিয়তা ও লোকসমাগমে উত্তরউত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। কেন? আপনারাতো স্বচক্ষেই দেখেছেন, এবারের সম্মেলনগুলোতে মানুষের উপস্থিতি এবং উৎসাহ উদ্দীপনা বিগত বছরগুলোর চেয়ে কতগুণ বেশি ছিল? আল্লাহ এই সম্মেলনের ধারাকে তা কিয়ামত জারি রাখুন। আমীন।

প্রখ্যাত উলামায়ে কেরামের মারকায পরিদর্শন

মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ বসুন্ধরা ঢাকা, প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বিশ্বের বড় বড় ও প্রখ্যাত উলামায়ে কেরাম, বুজুর্গানেদ্বীন ও পীর মাশায়েখগণের আগমন অব্যাহত রয়েছে। গেল ফেব্রুয়ারী মাসেও বিশ্ববরেণ্য কয়েকজন উলামায়ে কেরাম মারকাযে তাশরীফ এনেছেন। তাঁরা মারকাযের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন এবং ছাত্রদের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ নসীহত, ইসলাহী বয়ান এবং মূল্যবান তাকরীর পেশ করেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, কায়েদে মিল্লাত হযরতুল আল্লাম মাওলানা ফজলুর রহমান সাহেব পাকিস্তান, আওলাদে রাসূল সা. হযরত মাওলানা শাহ সায়্যিদ আব্দুল মজীদ নদীম সাহেব পাকিস্তান, হযরত মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক ইসকান্দর সাহেব পরিচালক ও শায়খুল হাদীছ জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া আল্লামা বিন্নুরী টাউন, পাকিস্তান, হযরত মাওলানা মুফতী জমীল আহমদ সাহেব মুহাদ্দিছ দারুল উলুম দেওবন্দ, ইউপি, ইন্ডিয়া, পাকিস্তান বেফাকুল মাদারিসের সেক্রেটারী হযরত মাওলানা হানিফ জালন্দরী সাহেব, মাওলানা মারগুব আহমদ সাহেব ডিউজবারী, ইউকে। এরপর পৃ:৪৩ ক:২